রমযানের শিক্ষা ও মুমিন জীবন

আমিনুল ইসলাম

সম্পাদনা
মাওলানা আব্দুল মান্নান তালিব
মাওলানা শামাউন আলী

রমযানের শিক্ষা ও মুমিন জীবন

গ্রন্থনা
আমিনুল ইসলাম

সম্পাদনা
মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব
মাওলানা শামাউন আলী

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.amarboi.org

রমযানের শিক্ষা ও মুমিন জীবন

গ্রন্থনাঃ আমিনুল ইসলাম
সম্পাদনাঃ
মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব
মাওলানা শামাউন আলী

প্রকাশক
এস এম রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয়
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

গ্রন্থস্বত্বঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রকাশকালঃ
প্রথম প্রকাশঃ মে, ২০০৯ইং
দ্বিতীয় সংস্করণঃ জুন ২০১১

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান

মূল্য ঃ ১১৫.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫১-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।

RAMZANER SHIKHA O MUMIN JIBON
Granthona: Aminul Islam, Edited by: Maulana Abdul Mannan Talib, Maulana Shamaun Ali, Published by: S.M. Raisuddin, Director (Publication), Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. **Price: Tk. 115.00 US$ 4.00 PABX : 984-70241-0003-0**

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ রোযা। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মাহে রমযানের রোযা আমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন। রাসূলে করীম (সা.) বহুবার বলেছেন রোযার গুরুত্বের কথা, এর ফযীলতের কথা এবং বাস্তব জীবনে রোযা পালনের নিযম-কানুন ও পদ্ধতির কথা।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ অর্ধ শতাব্দীর অধিক সময় ধরে এ দেশের মানুষের মাঝে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে আসছে। আমরা সব সময়ে চাই বুক সোসাইটির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ পাঠকের হাতে তুলে দিতে। দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হাতে রোযার বিধান এবং প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসাইল তুলে দেয়ার প্রত্যাশা নিয়েই আমাদের ক্ষুদ্র আয়োজন 'রমযানের শিক্ষা ও মুমিন জীবন'। আমরা জানি, রোযার উপর বেশ কিছু গ্রন্থ বাজারে রয়েছে, তথাপি আল-কুরআন ও অধিক সংখ্যক হাদীসের সন্নিবেশ ঘটিয়ে আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থখানিকে বিশেষভাবে বৈশিষ্টমণ্ডিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থখানি যদি পাঠকের আমলী যিন্দেগীর সামান্য পরিবর্তনও সাধন করে, তবে সেটাই আমাদের সফলতা।

পরিশেষে পাঠকের হাতে যথাসময়ে রমযান সংক্রান্ত গ্রন্থখানি পৌঁছে দেয়ার সুযোগ পেয়ে মহান মাবুদের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.amarboi.org

ভূমিকা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ - (البقرة : ١٨٣)

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।' (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৩)

রহমত, বরকত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস মাহে রমযান।

পরকালীন মুক্তির জন্য শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَايُفْتَنُوْنَ - (العنكبوت : ٢)

"মানুষ কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি একথা বলার পর তাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না।" (সূরা আনকাবুত ঃ ২)

মূলতঃ চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। আর সেই প্রশিক্ষণ নেয়ার সর্বোত্তম মাস হলো মাহে রমযান।

রাসূল (সা.) বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতেসাবের সাথে রমযানের রোযা পালন করবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ আল্লাহ্ মাফ করে দিবেন।' (বুখারী)

আমরা যেন কুরআন ও হাসীসের আলোকে মাহে রমযানের গুরুত্ব এবং আমাদের করণীয় ভালভাবে বুঝতে পারি, সেই প্রত্যাশা নিয়ে প্রকাশ করা হলো 'রমযানের শিক্ষা ও মুমিন জীবন' শীর্ষক গ্রন্থটি। আল্লাহ্ আমাদের যাবতীয় ভাল আমলের উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমীন॥

www.amarboi.org

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা	৭
রমযান মাসের গুরুত্ব	১০
রমযানের তাৎপর্য	১১
রোযার পরিচয়	১৫
রোযার গুরুত্ব	১৬
রোযার বিশেষ অর্জন	১৭
রোযার ফযীলত	১৯
রোযা না রাখার ভয়াবহ পরিণতি	২১
রোযার মর্যাদা	২২
রাইয়ান নামক দরযাটি রোযাদারদের জন্য নির্দিষ্ট	২৪
রোযা গুনাহের কাফফারা	২৪
রমযান মাসে নবী (সা.) অত্যধিক দান করতেন	২৬
যে রোযাদার মিথ্যা বলা ও তদনুযায়ী কাজ পরিত্যাগ করে না	২৬
ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকায় রোযা রাখা	২৭
গালি ও কটু বাক্যের জবাবে বলবে, 'আমি রোযাদার'	২৭
রমযানের চাঁদ দেখা	২৮
চাঁদ দেখার শরয়ী বিধান	৩২
রমযানের একদিন বা দুদিন পূর্বে রোযা রাখা যাবে না	৩৭
রমযানে সেহরীর জন্য আযান দেয়ার বিধান	৪০
সেহরী	৪১
রোযাদার ফজরের সময় পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকতে পারে	৪৫
সফরে রোযা রাখতে হবে কিনা	৫২
ঋতু অবস্থায় মেয়েরা নামায-রোযা করবে না	৫৫
ইফতার	৫৬
ইফতারের মাসাইল	৫৭
সাওমে বেসালের বিধান	৫৯
রোযার প্রকার ও রোযা রাখার নিষিদ্ধ দিন	৬০
তারাবীহর নামায	৬৫

www.amarboi.org

রমযানে তারাবীহ্‌র নামাযের ফযীলত ৬৫
তারাবীহ নামাযের হুকুম ৬৬
লাইলাতুল কদরের ফযীলত ৬৮
লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ নয় দিনে ৬৮
রমযানের শেষ দশ দিনের আমলের বর্ণনা ৭৪
ই'তিকাফ ৭৪
মহিলাদের ই'তিকাফ করা ৭৭
ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদের দরযায় আসা ৭৮
রমযানে দশ দিন ই'তিকাফ ৮১
পূর্ববর্তী নবীগণের যুগে রোযা ৮১
রোযার কতিপয় মাসাইল– ৮২
রোযা ফরয হওয়ার শর্তাবলী ৮২
রোযার ফরয ৮৩
রোযার সুন্নাত ৮৩
রোযা ভঙ্গের কারণ ৮৩
কাযা-কাফ্‌ফারার বিবরণ ৮৫
অন্যান্য মাসাইল ৮৮
মহিলাদের রোযার মাসায়েল ৯৪
সাদকায়ে ফিতর ৯৫
সাদকায়ে ফিতরের বিবরণ ও মাসাইল ৯৭
রোযা সম্পর্কে অমুসলিম মনীষীদের অভিমত ১০০
রোগ প্রতিরোধে রোযার ভূমিকা ১০১
রোযা স্বাস্থ্যের কি উপকার করে ১০৩
দুই ঈদের নামাযের বিবরণ ১০৪
ঈদের নামায কোথায় পড়া উত্তম? ১০৭
ঈদের নামায পড়ার নিয়ম ১০৮
যারা ঈদের নামায না পায় তারা কি করবে ? ১১০
রমযান ঃ জিহাদ ও বিজয়ের মাস ১১১

www.amarboi.org

প্রারম্ভিকা

মানব জাতির কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত বিধানের নাম ইসলাম। যুগে যুগে আল্লাহ তাঁর মনোনীত মহামানবদের মাধ্যমে মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন হিদায়াত। এই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ হেদায়াতের মহাগ্রন্থটির নাম আল-কুরআন। সূরা আল-বাকারার শুরুতেই এর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এ ভাবে ঃ

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ - اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ - وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ - اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

"এটি আল্লাহ্ তাআলার কিতাব, এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এটি জীবন যাপনের ব্যবস্থা সেই মুত্তাকীদের জন্য, যারা অদৃশ্যকে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। যে কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যেসব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবকেই বিশ্বাস করে এবং পরকালের প্রতি যাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। বস্তুতঃ এই ধরনের লোকেরাই তাদের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ জীবন ব্যবস্থার অনুসারী এবং তারাই কল্যাণ পাবার অধিকারী।" (সূরা বাকারা ঃ ২-৫)

কালেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত- এই পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলাম দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত। রোযা হচ্ছে ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করবো রমযানের গুরুত্ব, আমাদের কাঙ্ক্ষিত অর্জন এবং প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসাইল।

www.amarboi.org

রমযান শব্দটি رمض থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ পুড়িয়ে ফেলা, জ্বালিয়ে দেয়া। গুনাহকে পুড়িয়ে শেষ করে দেয় বলে এর নাম রমযান। রমযানের রোযাকে ফরয করে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

"হে ঈমাদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মত তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে। সম্ভবত: এভাবে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হবে।" (সূরা বাকারাঃ আয়াত ১৮৩)

এই আয়াত থেকে জানা গেল, রোযার মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া। তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ ভয় করা। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেছেন, তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা, তাঁর নাফরমানী না করা, আল্লাহকে স্মরণ করা, তাঁকে ভুলে না যাওয়া এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ও তাঁর কুফরী না করা ।

প্রখ্যাত তাবেঈ তালাত ইবন হাবীব (রহ.) বলেছেনঃ আল্লাহর প্রতি তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর আলোর রোশনীতে তাঁর হুকুমের আনুগত্য করা ও সওয়াবের আশা করা এবং আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে তাঁর নাফরমানী ত্যাগ করা।

উমর ইবন খাত্তাব (রা.) উবাই ইবন কা'ব (রা.)-কে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উবাই (রা.) বলেন, আপনি কি কাঁটাযুক্ত পথে চলেছেন ? উমর (রা.) বলেন, হাঁ। উবাই বলেন, কিভাবে চলেছেন ? উমর বলেন, গায়ে যেন কাঁটা না লাগে সেজন্য চেষ্টা করেছি ও সতর্কভাবে চলেছি। উবাই বলেন, এটাই হচ্ছে তাকওয়ার উদাহরণ।

অর্থাৎ সমাজে ছড়িয়ে থাকা অন্যায়, অসত্য, হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করে সাবধানতার সাথে সামনে অগ্রসর হওয়ার নামই হচ্ছে তাকওয়া।

সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল হয়েছে পবিত্র রমযান মাসে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

www.amarboi.org

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ج فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ط يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَايُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَاهَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-

"রমযান এমন একটি মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা স্পষ্ট হিদায়াত ও শিক্ষায় পরিপূর্ণ। যা হিদায়াতের পথ-প্রদর্শক এবং হক ও বাতিলের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য সূচনাকারী। সুতরাং এখন থেকে যে ব্যক্তিই এ মাসে জীবিত থাকবে, সে-ই পূর্ণ মাসের রোযা রাখবে। আর কেউ যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে কিংবা সফরে থাকে, তবে সে অন্য সময়ে রোযাগুলো পূর্ণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করে দিতে চান, কঠিন করতে চান না। এ ব্যবস্থা তোমাদেরকে এ জন্য বলা হচ্ছে যেন তোমরা রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে পারো আর যে হিদায়াত আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন সে জন্য তার মহত্ত্ব প্রকাশ করতে, স্বীকৃতি দিতে ও শোকরগোযার হতে পারো।" (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৫)

আমরা জানি, জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হচ্ছে হাদীস। তাই রোযার গুরুত্ব, মর্যাদা, প্রাপ্তি সহ খুঁটিনাটি বিভিন্ন দিক পরিষ্কার করার জন্য আল-কুরআনুল কারীম ও সহীহ বুখারীর কিতাবুস সাওম ও অন্যান্য কিতাব থেকে আলোচনা তুলে ধরছি।

www.amarboi.org

রমযান মাসের গুরুত্ব

মাহে রমযানে আমাদের জীবন বিধান মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল হওয়ার কারণেই রমযান মাসের এতো গুরুত্ব।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ -

'রমযান এমন একটি মাস; যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্যে হিদায়াত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ আর হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী দলীল। (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৫)

পূনরায় বলা হয়েছে :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -

"তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পায় সে যেন অবশ্যই তাতে রোযা পালন করে।" (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৮৫)

ইতিহাসে রমযানের গুরুত্ব

আল্লাহ দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে নবী-রাসুলের মাধ্যমে বহু আসমানী কিতাব প্রেরণ করেছেন। সকল কিতাব রমযান মাসেই অবতীর্ণ হয়।

نَزَلَتْ صُحُفُ اِبْرَاهِيْمَ اَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَاُنْزِلَتْ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَاضِيْنَ وَالاِنْجِيْلُ لِثَلاَثَ عَشَرَةَ وَالْقُرْاٰنُ لاَرْبَعَ عِشْرِيْنَ -

"হযরত ইবরাহীমের সহীফাসমূহ রমযান মাসের প্রথম রাতে নাযিল হয়েছে, তাওরাত কিতাব রমযানের ছয় তারিখ দিবাগত রাতে, ইনজীল এ মাসের তেরো তারিখে এবং কুরআন রমযান মাসের চব্বিশ তারিখ (রাতে) নাযিল হয়।" (মুসনাদে আহমদ, তাবারানী)

www.amarboi.org

রমযানের তাৎপর্য

১. রমযান রহমতের মাস

রমযান মাস রহমতের মাস হাদীস শরীফে এসেছেঃ

هُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَاَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَاٰخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ -

"এটি এমন একটি (রমযান) মাস, যার প্রথম দশক 'রহমতের', দ্বিতীয় দশক 'মাগফিরাতের' ও তৃতীয় দশক 'জাহান্নাম থেকে মুক্তি' লাভের জন্য নির্দিষ্ট।" (বায়হাকী)

"রমযানের প্রতিটি দিবা-নিশিতে অসংখ্য জাহান্নামবাসীকে মুক্তি দেয়া হয়। আর প্রতিটি মুসলমানের একটি করে দুআ কবুল করা হয়।"

রমযান মাসে আল্লাহর অপার রহমতের বারিধারা সকল মু'মিন বান্দার অন্তরকে সিক্ত করে তুলে। এরই মাধ্যমে তাদের ঈমানের তেজদীপ্ততা বৃদ্ধি পায়। ধন্য হয় প্রতিটি মানুষ। রমযানের রোযার ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্ট মু'মিনদের অভাবী ও দরিদ্র লোকদের দু:খ সরাসরি অনুভব করার বাস্তব শিক্ষা দেয়। গরীবের বন্ধু হয় ধনীরা। বুঝতে পারে তাদের দু:খ-দুর্দশা। একে অপরের দরদী হয়। দু:খ লাঘব করার প্রয়াসে একত্রে কাজ করে। তাতে সমাজের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। এ সব কিছুই আল্লাহর রহমতের কারণে। এজন্যেই বলা হয় রমযান মাস রহমতের মাস। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেভাবে বান্দাকে বেশী রহমত দেন, সেভাবে রোযাদারের উচিত আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি বেশী দয়ার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ -

"যমীনে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া করো। আসমানে যিনি আছেন তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

রাসূল (সা.) বলেনঃ রমযানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদরে জিবরাঈল (আ.) অন্যান্য ফেরেশ্‌তাগণের সাথে যমীনে নেমে আসেন এবং ঐ বান্দাহর জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দু'আ করেন, যে দাঁড়িয়ে, বসে আল্লাহ্‌র যিকর ও ইবাদতে মশগুল থাকে। (বায়হাকী)

www.amarboi.org

২. রমযান ইখলাসের মাস

ইখলাস হচ্ছে নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তির উদ্দেশ্যে জীবনের সকল কাজ করা। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ, পরোপকার, ইকামতে দ্বীনের কাজ করা, শিক্ষা দান করা, শিক্ষা গ্রহণ করা, মানুষকে খাওয়ানো, দান করা ইত্যাদি সকল নেক কাজ একমাত্র খালিসভাবে আল্লাহ উদ্দেশ্যে করতে হবে। নিয়ত খালিস না হলে ইবাদত শির্কযুক্ত হতে পারে। আর শির্কযুক্ত ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই আল্লাহ তাআলা রমযানের এক মাস রোযা ফরয করে লোক-দেখানো মনোবৃত্তি দূর করার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। রোযা এমন এক ইবাদত রোযাদার ব্যতীত আর কেউই বলতে পারবে না প্রকৃতপক্ষে সে রোযা রেখেছে কিনা ? মানুষ দেখবে না গভীর অন্ধকারে সে একাধিক রোযা ভঙ্গের কোন কাজ করলো কিনা অথবা গভীর পানিতে ডুব দিয়ে সে পানি পান করলো কিনা। রোযাদার কেবলমাত্র এক আল্লাহর ভয়েই সেখানে এমন কোন কাজ করে না যাতে করে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। এটাই হলো ইখলাস। জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল কাজে ও সকল ইবাদতে বান্দা যাতে নিষ্ঠাবান হয় রমযান সে শিক্ষাই দেয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ -

"আর তাদেরকে এটা ব্যতীত অন্য কোন হুকুমই দেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ইবাদত একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য করুক।" (বায়্যিনা ঃ আয়াত ৫)

৩. রমযান তাওবা কবুলের মাস

তাওবা শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। ফিরে আসা। গুনাহগার বান্দা স্বীয় গুনাহের কারণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে এ রকম গুনাহ যাতে পুনরায় সংঘটিত না হয় সে জন্য আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। বান্দা যত বড় গুনাহই করুক না কেন, সে যদি খাঁটি মনে তাওবা করে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়, তা হলে আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করেন এবং তাকে হকের পথে থাকার তাওফীক দেন।

www.amarboi.org

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন: "তিনি সেই সত্তা যিনি বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, তাদের গুনাহ মাফ করেন এবং তোমরা যা কিছু করো তা তিনি জানেন। (সূরা শুরা ঃ আয়াত ২৫)

ক্ষমা ও মাগফিরাতের বিরাট সুযোগ রয়েছে এ রমযান মাসে। এ মাসে দিবা- নিশিতে হরহামেশা আল্লাহ তাআলা দু'আ কবুল করেন এবং যে ক্ষমা প্রার্থনা করে তার তাওবা কবুল করেন। কাজেই আমাদের উচিত রমযান মাসে সগীরা কবীরা সকল গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর নিকট অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করা। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ -

"যে লোক রমযান মাসে রোযা রাখবে ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

৪. রমযান আত্মসংযমের মাস

রমযান মাস আত্মশুদ্ধির মাস। রোযা রাখার মাধ্যমে আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মশুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির মহান সুযোগ পাওয়া যায়, যা অন্য কোন ইবাদতে পাওয়া সম্ভব নয়। আত্মসংযম সাধনে রোযা হচ্ছে প্রশিক্ষণ স্বরূপ। আত্মসংযম ও সবরের মাধ্যমেই রোযার ফায়দা লাভ করা যায়। রোযা মানুষের নৈতিক চরিত্র এমন এক পর্যায়ে উন্নত করে, যাতে করে রোযাদার ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা, নফসের কামনা-বাসনার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারে। রোযা মানুষের দেহ-মনের সমস্ত শক্তিকে এমনভাবেই বশে রাখতে সক্ষম করে তোলে যে, সকল ধরনের লোভ-লালসা এবং নিজের নফসের অশুভ শক্তির মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। সাধারণত মানুষের পাশবিক কামনা-বাসনার উৎস হচ্ছে তিনটি জিনিস। যথা:

১. খাদ্য

২. যৌন চাহিদা

৩. বিশ্রামের চাহিদা।

www.amarboi.org

এ তিনটি জিনিসের জন্যই মানুষ দুনিয়াতে অন্যায়-অবিচার, যুলুম-নির্যাতন, ঝগড়া-বিবাদ ও সন্ত্রাসের মত জঘন্য কাজ করে থাকে। রোযা এ তিনটিকেই নিয়ন্ত্রণ ও করায়ত্ত করে ব্যক্তিকে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট সমর্পণ করিয়ে দেয়। তখন যদি কোন সন্ত্রাসী কোন রোযাদার ব্যক্তিকে ফেতনায় জড়াতে চায়, এমনকি হত্যা করতে চায়, তখনই সে একথা বলে দেয়, اَنَا صَائِم "আমি রোযাদার"। সংযম শিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা রোযা ছাড়া অন্য কোন ইবাদতে নেই।

৫. রমযান মাস পরিশ্রম ও প্রশিক্ষণের মাস

"পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।" শ্রম-সাধনা ছাড়া কোন কিছুই লাভ করা যায় না। রমযান হচ্ছে কঠোর পরিশ্রমের ও শ্রম-সাধনার মাস। পরবর্তী এগার মাসে আল্লাহর ইবাদত, হালাল রিযক অনুসন্ধান এবং দাওয়াতে হকের কাজসহ জীবনের যাবতীয় কাজের জন্য বান্দাকে কতটুকু পরিশ্রমী হতে হবে তারই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। রমযান মাসে ত্রিশ দিন ব্যাপী দীর্ঘ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করতে হয়। অতঃপর অবসাদগ্রস্ত শরীরে মাগরিবের নামায পড়তে হয়। একটু পরেই ইশা ও তারাবীহ নামাযের আহবান। তারাবীহ নামায শেষে একটানা ফজর পর্যন্ত না ঘুমিয়ে সেহরীর জন্য সুবহে সাদিকের পূর্বে সজাগ হতে হয়, তাহাজ্জুদের নামায পড়তে হয়, কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়নের পরপরই ফজরের নামায। এর চেয়ে পরিশ্রমের উত্তম কর্মসূচী আর কি হতে পারে? মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাআলা মুসলিম মিল্লাতের অলসতা ও শ্রমবিমুখতাকে দূর করার জন্যই এ সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ একই সাথে রমযানের সিয়াম সাধনায় মশগুল থাকে। কিভাবে রমযান শেষ হয়ে যায় রোযাদাররা তা টেরও পায় না।

৬. রমযান দাওয়াতে দ্বীনের মাস

রমযান হচ্ছে দাওয়াতে দ্বীনের সর্বোত্তম মাস। যেহেতু এ মাসেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে বিশ্ববাসীকে হকের দাওয়াত দেয়ার জন্য।

اُدْعُ اِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ -

"তোমার রবের দিকে ডাকো হিকমত ও উত্তম নসীহতের মাধ্যমে।"

দাওয়াতে দ্বীনের গুরু দায়িত্ব সকল নবীর উপরই ফরয ছিল। সকল নবী ও

www.amarboi.org

রসূল অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। তাদের নিকট দীনের দাওয়াত সম্বলিত গ্রন্থ রমযান মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে। একারণেই এ মাসের মর্যাদা অন্যান্য মাসের তুলনায় অধিক। তাই বলা হয় রমযান মাস দাওয়াতে দ্বীনের মাস। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর আজ উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর দাওয়াতে দ্বীনের গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এ কাজ করার উত্তম সময় হচ্ছে মাহে রমযান। এ সময় মানুষের মন-মানসিকতা সুন্দর থাকে। সত্য গ্রহণ করতে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। এজন্যে দাওয়াতী কাজও ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। রাসূল (সা.) রমযান মাসে দাওয়াতে দ্বীনের কাজ তীব্র থেকে তীব্রতর করতেন। আমাদেরও রমযান মাসে এ কাজ যথাযথ গুরুত্ব সহকারে করা উচিত।

রোযার পরিচয়

সাওবা বা রোযার শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। ইসলামের পরিভাষায়– সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিয়তে পানাহার ও স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলে। রোযা পালনকারীকে মিথ্যা কথা, মিথ্যা কাজ এবং পরনিন্দা ইত্যাদি নিকৃষ্ট কাজ থেকেও বিরত থাকতে হয়। আল্লামা জুরজানী (রহ.) বলেন :

هُوَ الاِمْسَاكُ عَنِ الاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ مِنَ الصُّبْحِ اِلَى الْمَغْرِبِ مَعَ النِّيَّةِ -

'নিয়ত সহকারে সুবহে সাদিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীগমন থেকে দূরে থাকাকে সাওম বলে।' মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন ঃ

هُوَ اِمْسَاكٌ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ مَعَ النِّيَّةِ -

'নিয়ত সহকারে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলে।'

www.amarboi.org

আইয়ামে জাহিলিয়াতে রোযা

হযরত ঈসা (আ.)-এর পর থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নুবুওয়াত লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে আইয়ামে জাহিলিয়াত বা জাহিলিয়াতের যুগ বলা হয়। এ সময় ইয়াহূদী, খৃস্টান ও মুশরিকরা বিভিন্নভাবে রোযা পালন করত। বিশেষ করে মক্কার কুরায়শরা আশূরার রোযা পালন করতো। (বুখারী)

মুহাররমের ১০ তারিখে কাবাঘরে গিলাফ লাগান হত সেদিন আরবরা রোযা রাখতো। (আহমদ)

সাওম ফরয হওয়ার সময় কাল

হযরত মুহাম্মদ (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় উপনীত হলে তিনি আশূরার রোযা পালন করেন এবং সাহাবীগণকে তা পালন করার নির্দেশ দেন। অত:পর দ্বিতীয় হিজরীতে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর 'আশূরার' রোযা সুন্নাতরূপে পরিগণিত হয়।

রোযার গুরুত্ব

ইসলামী জীবন বিধানে রোযার গুরুত্ব অপরিসীম। রোযাকে আল্লাহ্ তাআলা ফরয করেছেন। এটি ইসলামী যিন্দেগীর পঞ্চ স্তম্ভের চতুর্থতম স্তম্ভ। নবী করীম (সা.) বলেছেন, ইসলাম পাচঁটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা ঃ

১। আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়া।

২। নামায কায়েম করা।

৩। যাকাত প্রদান করা।

৪। রমযানের রোযা পালন করা।

৫। সামর্থবান ব্যক্তির বায়তুল্লাহর হজ্জ করা।

সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা স্থাপিত হয়। ধৈর্যশীল আত্মা, ও তাকওয়াপূর্ণ জীবনের প্রয়োজন। রোযা বা সিয়াম বান্দার মধ্যে সে সকল

www.amarboi.org

মহৎ গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। রোযা হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দার নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহপ্রেমে বিগলিত উন্নত আত্মা, উন্নত চরিত্র গঠন ও আত্মশুদ্ধির জন্য এক অনন্য পদ্ধতি।

রোযার বিশেষ অর্জন

১. আল্লাহর হুকুমের আনুগত্যের প্রশিক্ষণ ঃ আল্লাহর প্রভুত্ব এবং একত্ববাদের স্বীকৃতি তার ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। রোযার ন্যায় ইবাদত পালনের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর প্রভুত্বের নিরংকুশ স্বীকৃতি এবং নিজেকে আল্লাহর বান্দাহ মনে করে তাঁর হুকুমের আনুগত্য করে থাকে। রোযার মাসে নিষিদ্ধ সামগ্রীর ভোগ বিলাস ও পানাহার হতে বিরত থেকে দিনের বেলা বৈধ কাজগুলোকে তার হুকুমে সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করে আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

২. আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে ঃ ইসলামী শরীঅতের পরিভাষায় আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর আদেশ মেনে চলা এবং তাঁর নিষেধ থেকে দূরে থাকার নামই তাকওয়া। আর আল্লাহ রোযাকে ফরয করেছেন এ গুণ সৃষ্টির জন্যই। তাই রোযা দ্বারা মানুষের মাঝে খোদভীতি ও পরহেযগারিতার গুণ ও তার বৈশিষ্ট ফিরে আসে।

৩. নৈতিক চরিত্র উন্নত করে ঃ রোযা মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নত করে। রোযা রাখার ইচ্ছা করার সাথে সাথে মানুষের মন হতে পাপাচার, মিথ্যাচার, স্বেচ্ছাচারিতা, অসৎ কাজ ও ঝগড়া করার মানসিকতা দূর হয়ে যায় । কেননা, এগুলো পরিত্যাগ করতে না পারলে তার রোযাই হবে না। এ সম্পর্কে রাসূলের বাণী ঃ

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِىْ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ـ

"যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কাজ ছাড়তে পারেনি, তার পানাহার পরিত্যাগ করে রোযা রাখায় আল্লাহর কাছে কোন মূল্য নেই।" (বুখারী) কেউ যদি রোযা রেখে রোযার শিক্ষা ও উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজ করে

www.amarboi.org

মানুষের সাথে সদাচারের বিপরীত চরিত্র প্রদর্শন করে, তাহলে এ আনুষ্ঠানিক কাজের কোন ফল পাবে না। রাসূলের বাণী ঃ

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ اِلاَّ الظَّمَاءُ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ اِلاَّ السَّهْرُ -

"অনেক রোযা পালনকারী ক্ষুৎপিপাসা ছাড়া আর কোন কিছু লাভ করতে পারে না । তেমনি রাত্রিতে ইবাদতকারী অনেক মানুষও রাত্রি জাগরণ ছাড়া কিছু লাভ করতে পারে না। (সুনানে দারেমী)

৪. আল্লাহর শোকর আদায়ের মানসিকতা সৃষ্টি ঃ পবিত্র রোযার মাসে যে আল্লাহ তাআলা শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে রোযা রাখার তাওফীক দিলেন এবং অগণিত নিয়ামত দিয়ে সেহরী ও ইফতারী করার সুযোগ করে দিলেন, সেই আল্লাহ পাকের শোকরগুযারী করার জন্য মানুষের মনমানসিকতা পূর্বের চেয়ে আরো বেশী উন্মুখ থাকে। আল্লাহর বাণী ঃ

وَاشْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ -

"যদি তোমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করো, তবে তোমরা তাঁর দানরাজির শুকরিয়া আদায় করো।" (সূরা নাহল ঃ ১১৪)

৫. হালাল গ্রহণের বাস্তব প্রশিক্ষণ ঃ সিয়াম সাধনাকারী মানুষ হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম হিসেবে গ্রহণ ও বর্জনের বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেথাকে।

৬. নফসের কর্তৃত্ব বিলোপ ঃ রোযা দ্বারা রোযাদার ব্যক্তি নিজের নফসের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর হুকুম মানতে বিজয়ী হন। সিয়াম সাধনাই মানব প্রবৃত্তিকে তাকওয়ার বৈশিষ্টে মহিমান্বিত করে নিজেকে আল্লাহর মরযীর বিপরীত কাজ হতে বিরত রাখে। তাই রোযা দ্বারা মানবগণ নফসের উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ লাভ করে।

৭. আল্লাহর নৈকট্য লাভ ঃ রোযার মাধ্যমে রোযাদার ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমেই পরকালে সে আল্লাহর নৈকট্য ও দর্শন লাভে নিজেকে ধন্য করতে সক্ষম হবে।

৮. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয় ঃ আল্লাহ তা'য়ালা একই সময় সারা দুনিয়ার মুসলিম সমাজকে একই কর্মসূচীর আওতায় এনে একই ভাবধারায়

www.amarboi.org

পরিচালনা করার যে শিক্ষা দিচ্ছেন তাতে প্রত্যেক রোযাদার ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ পাকের অসীম ক্ষমতার প্রতি অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত হয় ও নিজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে।

৯. সাওম পালনে ধৈর্যশীল হওয়া যায় ঃ ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়াদি পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করে সত্যের ওপর সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য চরম ধৈর্যের প্রয়োজন। রোযা মানুষকে তেমনি ধৈর্যশীল করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَلصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ -

"রোযা ধৈর্যের অর্ধেক।" (তিরমিযী)

১০. তাকওয়ার বৈশিষ্ট অর্জিত হয় ঃ রোযা মানুষের মধ্যে তাকওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট সৃষ্টি করে। রোযা ফরয হওয়ার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন ঃ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ "যাতে তোমরা তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে পারো বা মুত্তাকী হতে পারো।" তাকওয়া মানব জাতির জন্য এক মৌলিক ও মহৎ গুণ। এ গুণ অর্জন করা প্রত্যেকটি মু'মিনের কর্তব্য। একমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমেই আল্লাহর নিকট বান্দার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে– অন্য কোন গুণের দ্বারা নয়। তাকওয়া মানে হচ্ছে সতর্কতা অবলম্বন করা। অর্থাৎ আল্লাহ বিরোধী ও আল্লাহর নিষিদ্ধ প্রত্যেকটি কাজ থেকে দূরে অবস্থান করা।

রোযার ফযীলত

রসূল (সা.) বলেন ঃ রমযানে জান্নাতের দরযা খোলার পর এর মধ্যে আর কোন দরযাই বন্ধ করা হয় না। আর একজন আহ্বানকারী ফেরেশ্‌তা এই বলে আহ্বান করে বলেনঃ "হে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী! অগ্রগামী হও এবং হে মন্দের উদ্যোগী পিছনে সরে যাও। আর আল্লাহর জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত ব্যক্তি বর্গ রয়েছে। তুমি হয়ত তাদের মধ্যে হতে পারো। এ আহ্বান প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমদ)

রাসূল (সা.) বলেন : রমযানের সম্মানার্থে জান্নাতকে সজ্জিত করা হয় এবং এ মাসের প্রথম রাতে আল্লাহর আরশের নীচে থেকে জান্নাতের পাতার

www.amarboi.org

ভেতর দিয়ে একটি মৃদুমন্দ বাতাস হুরদের উপর দিয়ে বয়ে যায়। তখন তারা রোমাঞ্চিত হয়ে বলতে থাকে : হে প্রভু! আপনি আপনার বান্দাদের মধ্য থেকে আমাদের জোড়া এনে দিন, যাদের দেখে আমাদের নয়ন যেন জুড়িয়ে যায় এবং তাদেরও চোখ দুটো তৃপ্ত হয়ে যায়। (বায়হাকী)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রমযানের রোযা ফরয করেছেন। আর আমি তাতে কিয়াম (তারাবীহ নামায পড়া)-কে সুন্নত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে পুণ্যের আশায় রমযানের রোযা রাখবে, তারাবীহ নাযায পড়বে, সে সকল পাপ হতে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যাবে যেমনভাবে সে জন্মদিনে নিষ্পাপ অবস্থায় জন্ম নিয়েছিল। (নাসাঈ, তারগীব)

সাওমের মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرُمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حَرُمَ -

অর্থ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন: তোমাদের সামনে রমযান মাস সমুপস্থিত। তা এক বরতময় মাস। আকাশের দরযাসমূহ উন্মুক্ত হয়ে যায় জাহান্নামের দরযাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং বড় বড় শয়তানগুলো আটক করে রাখা হয়। এ মাসে একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়ে অধিক উত্তম। যে লোক এ রাতের মহা কল্যাণ লাভ করা থেকে বঞ্চিত থাকলো, সে সত্যিই বঞ্চিত ব্যক্তি। (নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী)

عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ -

www.amarboi.org

"তুমি রোযা রাখো, রোযা সমতুল্য কোন ইবাদত নেই।" (নাসাঈ)

অপর এক হাদীসে আছে :

اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ -

"রোযা ঢাল স্বরূপ।" (মুসলিম)

ঢাল যেমনি শত্রুর আক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষাকারী ,রোযা তেমনি দুনিয়াতে গুনাহ থেকে এবং আখিরাতে জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী।

হযরত আবূ হুরায়য়া (রা.) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন : আদম (আ.) সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের জন্য ১০ থেকে ৭শ পর্যন্ত সওয়ার বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ বলেন, রোযা এর ব্যতিক্রম। এটি একমাত্র আমার জন্য এবং আমিই নিজ হাতে এর পুরস্কার দেবো। রোযা পালনে আমার বান্দাহ আমার সন্তোষ বিধানের জন্য স্বীয় ইচ্ছা-বাসনা ও নিজের পানাহার পরিত্যাগ করে থাকে। রোযাদারের রয়েছে ২টি আনন্দ। একটা হচ্ছে ইফতারের সময় এবং অন্যটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। আল্লাহর কাছে রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ মেশক আতরের সুঘ্রাণের চেয়েও অনেক উত্তম। আর রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখবে তখন যেন সে বেহুদা ও অশ্লীল কথাবার্তা না বলে এবং চীৎকার ও হট্টগোল না করে। অন্য কেউ যদি তাকে গালাগাল করে কিংবা তার সহিত ঝগড়া বিবাদ করতে আসে, তখন সে যেন বলে: আমি রোযাদার। (বুখারী ও মুসলিম)

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি রোযা রাখে, তার একদিনের রোযার বদৌলতে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখেন। (বুখারী, মুসলিম)

রোযা না রাখার ভয়াবহ পরিণতি

রমযান মাসের রোযা রাখার সওয়াব যেমন অত্যধিক রোযা না রাখার শাস্তিও তেমনি ভয়াবহ। কারণ রোযা রাখা ফরয।

রাসূল (সা.) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন ওযর ছাড়া রমযান মাসের একটি রোযা ছেড়ে দেয়, সে যদি সারা জীবন রোযা রাখে, তবু তার গুনাহের বদলা হবে না। (বুখারী)

www.amarboi.org

রোযার মর্যাদা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ فَاِنِ امْرِءٌ قَاتَلَهُ اَو شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ اَجْلِىْ اَلصِّيَامُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا ـ

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, (গুনাহ হতে আত্মরক্ষার জন্য) রোযা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং রোযাদার অশ্লীল কথা বলবে না বা জাহেলী আচরণ করবে না। কোন লোক তার সাথে ঝগড়া করতে উদ্যত হলে অথবা গাল-মন্দ করলে সে তাকে বলবে, 'আমি রোযা রেখেছি।' কথাটি দু'বার বলেন। যার মুষ্টিতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধি হতেও উৎকৃষ্ট। কেননা, সে (রোযাদার) আমার উদ্দেশ্যেই খাবার ও লোভনীয় বস্তু পরিত্যাগ করে থাকে। তাই আমি বিশেষ ভাবে রোযার পুরস্কার দান করবো। আর নেক কাজের পুরস্কার দশগুণ পর্যন্ত দেয়া হয়ে থাকে। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ نُوْدِىَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ : يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلٰوةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلٰوةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ

www.amarboi.org

وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَى مَنْ دُعِىَ مِنْ تِلْكَ الاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ -

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে এক জোড়া (দুটি জিনিস) খরচ করবে তাকে জান্নাতের সবগুলো দরযা থেকে ডেকে বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এই (দরযা) টি উত্তম। যে নামাযী তাকে নামাযের দরযা থেকে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ তাকে জিহাদের দরযা থেকে ডাকা হবে। যে রোযাদার তাকে রাইয়ান নামক দরযা থেকে ডাকা হবে, আর যে সদকাকারী তাকে সদকার দরযা থেকে ডাকা হবে। আবূ বকর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা-মাতা উভয়েই আপনার জন্য কোরবান হোক, যাকে বেহেশ্তের ঐ সবগুলো দরযা থেকেই ডাকা হবে তার জন্য তো কোন ক্ষতির কারণ নেই। তবে প্রকৃতই কি কাউকে সবগুলো দরযা থেকে ডাকা হবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হাঁ হবে। আর আমি আশা করি তুমি হবে তাদেরই একজন। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ -

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ রমযান মাস আসলে জান্নাতের দরযাসমূহ খুলে দেয়া হয়। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَاُغْلِقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ -

www.amarboi.org

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ রমযান মাস শুরু হলে আসমানের দরযাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, দোযখের দরযাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শিকল লাগিয়ে বন্দী করা হয়। (বুখারী)

রাইয়ান নামক দরযাটি রোযাদারদের জন্য নির্দিষ্ট

عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَاِذَا دَخَلُوْا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ ـ

সাহল (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন ঃ বেহেশ্তের রাইয়ান নামক একটি দরযা আছে। কিয়ামতের দিন এটি দিয়ে শুধুমাত্র রোযাদাররা বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে। (কিয়ামতের দিন রোযাদারদেরকে ডেকে) বলা হবে, রোযাদাররা কোথায় ? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে। তারা ছাড়া আর একজন লোকও এ দরযা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই তা বন্ধ করে দেয়া হবে। তারা প্রবেশ করে দেখতে পাবে তাদের পূর্বে ঐ দরযা দিয়ে আর একজনও প্রবেশ করেনি। (বুখারী)

রোযা গুনাহের কাফফারা

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ مَنْ يَّحْفَظُ حَدِيْثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ اَنَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِىْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصَّلٰوةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ قَالَ لَيْسَ اَسْأَلُ عَنْ هٰذِهِ اِنَّمَا اَسْأَلُ

www.amarboi.org

عَنِ الَّتِىْ تَمُوْجُ كَمَا يَمُوْجُ الْبَحْرُ قَالَ اِنَّ دُوْنَ ذٰلِكَ بَابًا مُغْلَقًا قَالَ فَيُفْتَحُ اَوْ يُكْسَرُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ ذٰلِكَ اَجْدَرُ اَنْ لاَ يُغْلَقَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْنَا لِمَسْرُوْقٍ سَلْهُ اَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مِنَ الْبَابِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ اَنَّ دُوْنَ غَدِنِ اللَّيْلَةُ -

হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদিন উমর (রা.) সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, ফিতনা সম্পর্কে নবী (সা.)-এর হাদীস জানা আছে এমন কেউ আছে কি? হুযায়ফা বললেন, আমি আছি। আমি নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, সন্তান ও পরিবার পরিজন, ধন-সম্পদ এবং প্রতিবেশীই একজন লোকের জন্য ফিতনা। আর নামায, রোযা ও সদকা হলো এ ফিতনার কাফফারা। এ কথা শুনে তিনি (উমর) বললেন, এ ফিতনা সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করছি না, বরং যা সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় বিশাল হবে ও অবিরত ধারায় আসতে থাকবে, সেই ফিতনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি। তিনি (হুযায়ফা) বলেলেন, এরূপ ফিতনার সামনে একটি দরযা বন্ধ আছে। তিনি (উমর) বললেন, সে দরযা খোলা হবে, না ভেঙে ফেলা হবে ? তিনি (হুযায়ফা) বললেন, ভেঙে ফেলা হবে। আর কিয়ামত পর্যন্ত তা বন্ধ হওয়ার মত থাকবে না। (এ কথা শুনে) আমরা মাসরূককে বললাম, তাঁকে জিজ্ঞেস করুন, উমর কি জানতেন দরযা কে ? তখন তিনি তা জিজ্ঞেস করলে হুযায়ফা বললেন, হাঁ আগামী প্রভাতের পর রাত আসা যতখানি নিশ্চিত, ততখানি নিশ্চিতভাবেই তিনি তা জানতেন। (বুখারী)

www.amarboi.org

রমযান মাসে নবী (সা.) অত্যধিক দান করতেন

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِيْ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْاٰنَ فَاِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ كَانَ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ ـ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মানুষের কল্যাণের জন্য গোটা মানব জাতির মধ্যে নবী (সা.) সবচেয়ে বড় দানশীল ছিলেন। রমযান মাসে জিবরাঈল যে সময় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি রমযান মাসে প্রতি রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। এভাবেই রমযান মাস অতিবাহিত হতো। নবী (সা.) (এ সময়) তাঁর সামনে কুরআন শরীফ পড়ে শুনাতেন। যখন জিবরঈল তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি গতিবান বায়ুর চাইতে বেশী দানশীল হয়ে উঠতেন। (বুখারী)

যে রোযাদার মিথ্যা বলা ও তদনুযায়ী কাজ পরিত্যাগ করে না

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ اَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ـ

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, (রোযা থেকেও) কেউ যদি মিথ্যা কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ না করে, তবে তার শুধু খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় (রোযা রাখায়) আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী)

www.amarboi.org

ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকায় রোযা রাখা

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَمْشِىْ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَلْبَاءَةُ النِّكَاحُ -

হযরত আলকামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সাথে পথ চলছিলাম। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) বললেন, আমরা নবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি [নবী (সা.)] বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ রাখে, তার বিয়ে করা উচিত। কেননা, বিয়ে চোখকে অবনতকারী ও গুপ্তাঙ্গের হিফাযতকারী। আর যে বিয়ে করতে সমর্থ নয়, তার রোযা রাখা অবশ্য কর্তব্য। কেননা, রোযা যৌন তাড়নাকে অবদমিত করে রাখে। আবূ আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেছেন, باءة শব্দের অর্থ হলো বিয়ে। (বুখারী)

গালি ও কটু বাক্যের জবাবে বলবে, 'আমি রোযাদার'

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ اِلاَّ الصِّيَامُ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرِءٌ صَائِمٌ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ

www.amarboi.org

يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ وَاِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ -

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, রোযা ছাড়া বনী আদমের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য। (সব কাজেরই পুরস্কার তাকে দেয়া হবে।) তবে রোযা আমার জন্য নির্দিষ্ট। আমি নিজে ইচ্ছামত (যতটা চাইব) এর পুরস্কার প্রদান করবো, রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ রোযা রাখলে শোরগোল বা চেঁচামেচি করবে না কিংবা অশ্লীল কথা বলবে না। কেউ তার সাথে ঝগড়া করলে বা গালমন্দ করলে শুধু বলবে, 'আমি রোযাদার'। আর সেই মহান সত্তার শপথ যার মুঠিতে মুহাম্মদের জীবন। রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশক আম্বরের চেয়ে সুগন্ধিযুক্ত হবে। রোযাদারের জন্য দুটি খুশীর বিষয় রয়েছে। যখন সে ইফতার করে, তখন একবার খুশীর কারণ হলো। আরেক বার যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাৎ করে রোযার বিনিময়ে খুশী হবে। (বুখারী)

রমযানের চাঁদ দেখা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَافْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ -

ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি। তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখলে রোযা রাখবে আর (শাওয়ালের) চাঁদ দেখলে ইফতার কর (রোযা বন্ধ করবে)। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করো। (বুখারী)

নবী (সা.)-এর বাণী, তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো। ছেলা আম্মার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আম্মার বলেছেন, যে ব্যক্তি সন্দেহজনক দিনে রোযা রাখে, সে আবুল কাসিম-এর নাফরমানী করে।

www.amarboi.org

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ ـ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) রমযান সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন, তোমরা (রমযানের) চাঁদ না দেখে রোযা রেখো না। আবার চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ইফতারও করো না। আর আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করো। (বুখারী)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ لَيْلَةً فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ ـ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মাস উনত্রিশ রাত বিশিষ্ট হয়। তাই তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রেখো না। আকাশ মেঘে ঢাকা থাকার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। (বুখারী)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَخَفَسَ الاِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ ـ

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, এতো এতো দিনে মাস হয় (দু'হাতের দশটি আঙ্গুল তিনবার দেখিয়ে)। তৃতীয়বার তিনি (একটি) বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করে রাখলেন। (অর্থাৎ কোন কোন মাস উনত্রিশ দিনেও হয় বলে বুঝালেন।) (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ

www.amarboi.org

وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ اُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ -

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আবুল কাসিম বলেছেন চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো (রোযা শেষ করো)। তবে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে শাবানের ত্রিশ তারিখ পূর্ণ করো। (বুখারী)

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ يَوْمًا غَدَا اَوْ رَاحَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّكَ حَلَفْتَ اَنْ لاَّ تَدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ يَوْمًا -

উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) তাঁর স্ত্রীদের সাথে এক মাসের জন্য 'ঈলা' করলেন (অর্থাৎ এক মাস যাবত স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা না করার কসম করলেন।) উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে সকালে অথবা সন্ধ্যায় তিনি তাদের কাছে গেলেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি তো এক মাস পর্যন্ত না যাওয়ার জন্য শপথ করেছেন! জবাবে নবী (সা.) বললেন, মাস তো উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে। (বুখারী)

عَنْ اَنَسٍ قَالَ اٰلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ اِنْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَاَقَامَ فِيْ مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اٰلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ -

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সা.) স্ত্রীদের সাথে 'ঈলা' করলেন। এ সময় তার পায়ের গিরা ফুলে গিয়েছিল। উনত্রিশ রাত পর্যন্ত

www.amarboi.org

তিনি একটি কামরায় অবস্থান করলেন এবং পরে সেখান থেকে বেরিয়ে স্ত্রীদের কাছে গেলে সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনি তো এক মাসের কসম করেছিলেন। জবাবে তিনি বললেন, "মাস তো উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।" (বুখারী)

ঈদের দুটি মাসই পরপর উনত্রিশ দিনে হয় না। (অর্থাৎ রমযান মাস উনত্রিশ দিনে হলে যিলহজ্জ ত্রিশ দিনে হবে। আর যিলহজ্জ উনত্রিশ দিনে হলে রমযান ত্রিশ দিনে হবে।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيْدِ رَمَضَانَ وَذُو الْحِجَّةِ ـ

আবদুর রহমান ইবন আবূ বাকরাহ (রা.) তার পিতা আবূ বাকরার মাধ্যমে নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সা.)] বলেছেন, এমন দুটি মাস আছে যার উভয়টিই (পরপর) ঘাটতি (উনত্রিশ দিনে) মাস হয় না। আর তা হলো ঈদের দুটি মাস- রমযান ও যিলহজ্জ। (বুখারী)

রমযান মাস উনত্রিশ বা ত্রিশ দিনে হয়

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسَبُ اَلشَّهْرُ هَكَذَا هَكَذَا يَعْنِىْ مَرَّةً تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلاَثِيْنَ ـ

ইবনে উমর (রা.) নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) বলেছেন, আমরা উম্মী জাতি। লিখতে জানিনা, হিসাব নিকাশ করতেও জানি না। তবে মাস এতো দিনে আর এতো দিনে হয়ে। অর্থাৎ কখানো উনত্রিশ দিনে আবার কখনো ত্রিশ দিনে। (বুখারী)

www.amarboi.org

চাঁদ দেখার শরয়ী বিধান

চাঁদ দেখার গুরুত্ব অপরিসীম। নবী (সা.) এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দিতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) শা'বান মাসের দিনগুলো ও তারিখগুলো যেমন চিন্তা ভাবনা ও হিসাব করে মনে রাখতেন অন্য মাসের তারিখগুলো এতো যত্নসহকারে মনে রাখতেন না। তারপর তিনি রমযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখতেন। কেননা, চাঁদ দেখে রোযা রাখতে হবে এবং চাঁদ দেখেই রোযা ভাঙ্গতে হবে অর্থাৎ ঈদ করতে হবে। অন্যথায় রোযার মধ্যে ত্রুটি এসে যাবে। রোযা ও হজ্জ চাঁদ উদয়ের সাথে সম্পর্কিত এবং নামায সূর্য উদয় ও অস্তের সাথে সম্পর্কিত। তাই ইসলামী বিধান মতে মুসলমানদের উপর শা'বানের ২৯ তারিখ ও রমযানের ২৯ তারিখ চাঁদ দেখার চেষ্টা করা ওয়াজিবে কিফায়া।

রমযান ও শাওয়ালের চাঁদ দেখার বিধান

আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে, তাহলে দু'-এক জনে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে যদি আকাশে মেঘ থাকে তাহলে রমযানের চাঁদের ক্ষেত্রে একজন পুরুষ বা দুইজন স্ত্রীলোকের ও ঈদের চাঁদের ক্ষেত্রে দু'জন বিশ্বস্ত মুসলমানের অথবা একজন পুরুষ বা দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। (বেহেশতী যেওর)

কে সাক্ষ্য দিবে এবং কোথায় সাক্ষ্য দিবে?

কোন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি যদি রমযানের চাঁদ দেখে তবে সে আযাদ হোক বা গোলাম কিংবা স্ত্রীলোক হোক কাজীর নিকট রাতেই সাক্ষ্য দেওয়া জরুরী। এটা শহরের হুকুম। এর বাইরে হলে স্থানীয় মসজিদে গিয়ে সাক্ষ্য দিবে।

চাঁদ কি সকল এলাকা থেকে দেখা জরুরী?

একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুন রমযানের চাঁদ দেখতে পাননি। এক বেদুঈন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নিকট এসে বলল ইয়া রাসূলাল্লাহু! আমি চাঁদ দেখেছি। এ লোকটি মুসলমান কিনা তিনি জানতে চাইলে লোকটি বললো

www.amarboi.org

আমি মুসলমান। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বিলাল (রা.)-কে বললেন, হে বিলাল! মানুষের মধ্যে প্রচার করে দাও যে, তারা যেন আগামী কাল থেকে রমযানের রোযা রাখে।

এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, একই সাথে সকল এলাকায় চাঁদ দেখা শর্ত নয়, বরং নির্দিষ্ট ভূখন্ডের যে কোন এলাকায় চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে সকলের জন্য তা প্রযোজ্য হবে।

কতটুকু এলাকার জন্য চাঁদ দেখার একই হুকুম?

সমগ্র পৃথিবীতে চাঁদ দেখার অবস্থা এক নয়। কোন শহরে একদিন আগে এবং অন্য শহরে একদিন পরে চাঁদ দেখা যায়। এক শহর থেকে অন্য শহরের দূরত্বের কারণে এ অবস্থা হয়। সাধারণত পাঁচ থেকে ছয়শ' মাইলের মধ্যে একই দিন চাঁদ দেখা যায়। তাই উল্লিখিত সীমারেখার মধ্যে যে কোন এক এলাকায় চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে তা সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে। (মাসাইলে রোযা)

চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেওয়া

প্রথমেই একথা জেনে নেয়া দরকার যে, সাক্ষ্য ও খবর এক বিষয় নয়, বরং বিষয় দুটি ভিন্ন ভিন্ন। কোন কোন বিষয় আছে যা খবরের মাধ্যমে বিশ্বাসের স্তরে পৌঁছে, কিন্তু সাক্ষ্য গ্রহণের স্তরে পৌঁছে না। ইসলাল করেনি বরং দুনিয়ার স্বাভাবিক বিধানেও পার্থক্য করা হয়েছে। রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, ইন্টারনেট বা পত্রিকার মধ্যেমে যে খবর প্রচার কর হয়, তা সঠিক হওয়ার মাধ্যমে দুনিয়ার সমস্ত কাজ করা হয়। কিন্তু এ খবরের ভিত্তিতে আদালত কোন রায় ঘোষণা করতে পারে না। এ জন্য সাক্ষী তলব করা হয়। যে চাঁদ দেখার উপর রোযা আরম্ভ করা ও ভঙ্গ করা নির্ভরশীল এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইসলাম চাঁদ দেখা খবরের উপর নির্ভর করেনি, বরং সাক্ষীর উপর নির্ভর করেছে। (মাযাহেরে হক)

উড়োজাহাজে চড়ে চাঁদ দেখার বিধান

রোযা চান্দ্রমাসের সাথে সম্পর্কিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোযা ভঙ্গ করো" (ঈদ করো)।

www.amarboi.org

চাঁদ দেখা। চাঁদ তো আকাশে থাকেই। এর অস্তিত্ব খোঁজার কোন যৌক্তিকতা নেই। উড়োজাহাজে চড়ে কিংবা দূরবীনের সাহায্যে আকাশে চাঁদের অস্তিত্ব প্রমাণ করলে তা চাঁদ দেখা হবে না। জমিনে থেকে খালি চোখে তা দেখলে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে। বিশ হাজার ফিট উপরে উড্ডয়ন করে কেউ যদি চাঁদের অস্তিত্বের কথা বলে, তাহলে সে এলাকার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হবে না। (আলাতে জাদীদাহ)

চাঁদ দেখার সাক্ষী হওয়ার কতিপয় শর্ত

চাঁদ দেখার সাক্ষী হওয়ার যোগ্যতার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। এ শর্তগুলো অনুপস্থিত থাকলে তার সাক্ষ্য গ্রহণয়োগ্য হবে না।

১. عاقل অর্থাৎ জ্ঞানবান হওয়া।

২. بالغ অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

৩. সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া, তাই পাগলের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নয়।

৪. মুসলমান হওয়া। তাই কোন অমুসলিম সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫. সাক্ষ্য কথাটি উল্লেখ করবে যেমন বলবে, আমি নিজ চোখে চাঁদ দেখেছি বা অমুক বিষয়টি ঘটতে দেখেছি। কিংবা আমি অমুক ঘটনার সাক্ষ্য দিচ্ছি। শুধু শুনে কোন কথা বললে সেটা সাক্ষ্য হবে না, বরং সেটা খবর হবে, যা বিশ্বস্ততার সামনে সঠিক হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।

৬. সাক্ষীকে বিচারকের সামনে উপস্থিত হতে হবে। সুতরাং পর্দার আড়াল থেকে বা পত্র দ্বারা অবহিত করলে কিংবা রেডিও টেলিভিশনের খবর শুনে সাক্ষ্য দিলে তা সাক্ষ্য হবে না। বরং খবরের অন্তর্ভুক্ত হবে। (মাসাইলে রোযা)

রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে চাঁদ দেখার সংবাদ প্রচার ও তার বিধান

ইসলামী সরকার যদি এমন একটি হেলাল কমিটি গঠন করে যারা শরীঅতসম্মত সাক্ষীর মাধ্যমে চাঁদ দেখার প্রমাণ সংগ্রহ করে তা রেডিও টেলিভিশনে প্রচার করে, তবে তার উপর আমল করা শুদ্ধ হবে।

চাঁদ দ্রষ্টাগণ হেলাল কমিটির নিকট সাক্ষ্য প্রদান করবে। তাদের সংখ্যা

www.amarboi.org

দু'চার জন হলে হেলাল কমিটির কমিটি চিঠি, টেলিফোন বা ওয়ারলেসের মাধ্যমে তাদের থেকে সংবাদ পেয়ে চাঁদ উদয়ের সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না বরং তাদেরকে হেলাল কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দানের নিয়ম মাফিক সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। অথবা কমিটির কোন যোগ্য প্রতিনিধি বিজ্ঞ আলিম চাঁদ দ্রষ্টাদের নিকট উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্যগ্রহণ পূর্বক নিয়ম মোতাবেক সিদ্ধান্ত করবে। অত:পর কমিটির সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে স্বয়ং কমিটির কোন আলিম কিংবা রেডিও কিংবা টেলিভিশনের কোন নির্ভরযোগ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে কিভাবে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলো তার ব্যাখ্যাসহ চাঁদ উদয়ের সংবাদ প্রচার করবে। তবে সরকারের যদি কেন্দ্রীয় হেলাল কমিটির দেখার বিষয়টি মীমাংসা করার পুরো ক্ষমতা প্রদান করা হয়, তাহলে এ কমিটির সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্য চিঠি কিংবা পরিচিত কণ্ঠের টেলিফোন মোবাইল ফোন বা ওয়ারলেসের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় হেলাল কমিটিকে অবহিত করলে তারা ব্যাখ্যাসহ রেডিও টেলিভিশনে প্রচার করতে পারবে।

বহু সংখ্যক লোক যদি চাঁদ দেখে থাকে আর তারা সকলে পৃথক পৃথক ভাবে হেলাল কমিটির নিকট পত্র লিখে বা ফোনের মাধ্যমে অবহিত করে এবং কমিটি তাদেরকে চিনতে পারে এবং তাদের সংবাদের উপর আস্থা অর্জন হয়, তাহলে হেলাল কমিটি চন্দ্র উদয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা রেডিও এবং টিলিভিশনে প্রচার করতে পারবে।

কেন্দ্রীয় হেলাল কমিটি কর্তৃক প্রচারিত চাঁদ ওঠার সংবাদের প্রতি দেশের সকল মুসলমানের আমল করা ওয়াজিব।

বি.দ্র.ঃ চাঁদ দেখার বিষয়টি শুধু ২৯ তারিখের চাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উক্ত তারিখে চাঁদ দেখার কোন সংবাদ পাওয়া না গেলে ৩০ দিন পূর্ণ করে ঈদ উদ্‌যাপন করবে। কারণ চান্দ্র মাস ৩১ দিনে হয় না।

টেলিফোন/মোবাইলের মাধ্যমে চাঁদ দেখার খবর সম্পর্কিত বিধান

এমন এলাকা থেকে যদি এতো অধিক হারে হেলাল কমিটির নিকট ফোন আসতে থাকে, যে এলাকায় প্রসিদ্ধ আলিম ও মুফতী রয়েছেন এবং তারা বলেন যে, আমরা নিজ চোখে চাঁদ দেখেছি কিংবা আমাদের শহরের কাযী কিংবা হেলাল কমিটি আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে চাঁদ উদয়ের ফায়সালা

www.amarboi.org

দিয়েছেন, তখন এতো অধিক সংখ্যক ফোনে এ খবর দেওয়ার কারণে মিথ্যা হওয়ার সন্দেহ দূর হয়ে যাবে এবং হেলাল কমিটি এ খবরের উপর ভিত্তি করে ঈদের চাঁদ দেখার ঘোষণা দিতে পারবে। দু'-একটি ফোন আসা যথেষ্ট হবে না। (জাদীদ ফি মাসাইল)।

চাঁদ দেখার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরও যদি কেউ রোযা ভঙ্গ না করে তার বিধান

শরীঅতসম্মত সাক্ষীর মাধ্যমে কিংবা শরীঅতসম্মত হেলাল কমিটির মাধ্যমে চাঁদ উদয়ের ঘোষণার পরও যদি কেউ রোযা ভঙ্গ না করে তাহলে সে গুনাহ্গার হবে। কেননা ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। (আহসানুল ফাতাওয়া)

যে সকল অঞ্চলে বছরে ছ'মাস অন্তর অন্তর ২৪ ঘন্টায় মাত্র অর্ধ ঘন্টা রাত বা অর্ধঘন্টা দিন হয়, সে সকল অঞ্চলে সেহরী ও ইফতাররের বিধান

প্রতি ২৩ ঘন্টার সূর্য অস্তমিত থাকার সময় যদি এ পরিমাণ হয় যাতে প্রয়োজনীয় পানাহার সেরে নেয়া সম্ভব, তাহলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে তেইশ ঘন্টা কাল ব্যাপী রোযা রাখবে। যদি এত দীর্ঘ সময় রোযা রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে বছরের ছোট দিনগুলোতে তার কাযা করবে। আর সূর্যাস্তের পর প্রয়োজন মতো পানাহার করবে। যদি অবকাশ না থাকে আর সূর্যাস্তের সাথে সাথেই সূর্য পুনরায় উদিত হয়, কিংবা যদি এমন হয় যে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সূর্যই উদিত হয় না তাহলে পার্শ্ববর্তী এলাকার সূর্যাস্তের হিসাব অনুপাতে পানাহার করবে। অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী এলাকায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে কখন সূর্য অস্তমিত হয় আর তা কত সময় কাল বহাল থাকে তা জেনে নিয়ে ঠিক সে সময়টুকুতে পানাহার সেরে নেবে অথবা বৎসরের সে দিনগুলোতে তথায় সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়ের পরিমাণ নির্ণয় করবে। অত:পর হিসাব মোতাবেক প্রতি ২৪ ঘন্টা সময়ের যে অংশে আসরের নামায আদায় করবে তখন থেকে উক্ত নির্ণীত পরিমাণ সময় অতিক্রম হওয়ার পর ইফতার করে নেবে। ঠিক এ বিধানই প্রযোজ্য হবে যখন বিমানে ভ্রমণের কারণে দিন ছোট বড় হয়ে যায়। (মুখতাসারুল কুদূরী)

www.amarboi.org

নতুন চাঁদ দেখার পর দোয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) নতুন চাঁদ দেখলে বলতেন :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالاَمْنِ وَالاِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالاِسْلاَمِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ -

অর্থ ঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ হে আল্লাহ! এ চাঁদকে আমাদের জন্য নিরাপত্তা, ঈমান ও ইসলামের চাঁদ হিসেবে উদিত কর যে কাজ তোমার পসন্দনীয় এবং প্রিয়, সে কাজের তাওফীক আমাদের দান কর। তোমার এবং আমাদের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ। (তিরমিযী ও দারেমী)

রমযানের একদিন বা দুদিন পূর্বে রোযা রাখা যাবে না

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ اُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ -

আবূ হুরায়রা (রা.) নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) বলেছেন, তোমরা কেউ রমযানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে রোযা রেখো না। তবে কেউ প্রতিমাসে ঐ সময় রোযা রাখতে অভ্যস্ত হলে রাখতে পারবে। (বুখারী)

www.amarboi.org

রমযানে রাতের বেলায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করার

মহান আল্লাহর বাণী

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ ط هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ج فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ـ

"রোযার সময় রাতের বেলা স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা (যৌনমিলন) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের আবরণ আর তোমরা তাদের আবরণ। আল্লাহ জানেন যে, চুপে চুপে তোমরা নিজে নিজের সাথে খেয়ানত করে যাচ্ছিলে। তিনি তোমাদের এই অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন তোমরা নিজের স্ত্রীর সাথে মেলামেশা (যৌনমিলন) করতে পারো। আর যে আনন্দ তোমাদের জন্য জায়েয করেছেন তা ভোগ করতে পারো।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الاِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ اَنْ يُّفْطِرَ لَمْ يَاْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَايَوْمَهُ حَتّٰى يُمْسِىَ وَاِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الاَنْصَارِىَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الاِفْطَارُ اَتٰى اِمْرَاَتَهُ فَقَالَ لَهَا اَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لاَ وَلٰكِنْ اَنْطَلِقُ وَاَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَجَاءَتْ اِمْرَاَتُهُ فَلَمَّا رَاَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِىَ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ اُحِلَّ

www.amarboi.org

لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ فَفَرِحُوْا بِهَا فَرَحًا شَدِيْدًا وَنَزَلَتْ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ -

বারা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবীদের কেউ রোযা রাখলে ইফতারের সময় ইফতারী উপস্থিত করলে ইফতার করার পূর্বে কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি আর কিছুই খেতেন না এবং পরের দিনও সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবেই রোযা রাখতেন। এক সময়ের ঘটনাঃ কায়েস ইবন সিরমা আনসারী রোযা রেখেছিলেন। ইফতারের সময় হলে তিনি স্ত্রীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে খাবার মত কিছু আছে কি ? স্ত্রী জওয়াব দিলেন, না। তবে আমি তালাশ করে দেখে আসি তোমার জন্য কিছু যোগাড় করতে পারি কিনা। কায়েস ইবন সিরমা আনসারী এ সময় মজুরী খেটে খেতেন। (স্ত্রী খাবার তালাশে যাওয়ার পর) ঘুমে তার চোখ মুদে আসলো। তাঁর স্ত্রী ফিরে এসে এ অবস্থা দেখে বলে উঠলেন, তোমার জন্য আফসোস! পরদিন দুপুর হলে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। সংবাদটি নবী (সা.)-এর নিকট পৌছলে কুরআনের আয়াত নাযিল হলো- "রমযানে রাত্রির বেলা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা (যৌনমিলন) হালাল করা হয়েছে।" এ হুকুম অবহিত হয়ে সবাই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এরপর নাযিল হলো, "তোমরা খাও, পান করো যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ» عَمَدْتُ اِلَى عِقَالٍ اَسْوَدَ وَاِلَى عِقَالٍ اَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِيْ فَجَعَلْتُ

www.amarboi.org

اَنْظُرُ فِى اللَّيْلِ فَلاَ يَسْتَبِيْنُ لِىْ فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ ذٰلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ -

আদী ইবনে হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে সময় حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود - "খাও ও পান করো যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে" নাযিল হলো তখন আমি একটি কালো ও একটি সাদা রংয়ের রশি নিয়ে আমার বালিশের নীচে রেখে দিলাম। রাতের বেলা আমি (রশি দুটি বার বার) দেখতে থাকলাম। কিন্তু তা স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম না। সকালেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গিয়ে সব বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, এর অর্থ হলো রাতের অন্ধকার ও ভোরের আলো। (বুখারী)

রমযানে সেহরীর জন্য আযান দেয়ার বিধান

নবী (সা.)-এর বাণীঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের সেহরী খাওয়া বন্ধ না করে দেয়– (অর্থাৎ বিলালের আযান শুনে তোমরা সেহরী খাওয়া বন্ধ করবে না)।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرُ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ اَذَانِهِمَا اِلاَّ اَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلُ ذَا -

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল রাত থাকতে আযান দিতেন। তাই রসূলুল্লাহ আদেশ করেছিলেন ইবনে উম্মে মাকতুম আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করো। কেননা, ফজর (উদয়) না হওয়া

www.amarboi.org

পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না। কাসিম ইবনে মুহাম্মদ বর্ণনা করেছেন তাদের উভয়ের (বিলাল ও ইবনে উম্মে মাকতুম) আযানের মধ্যে এতোটুকু মাত্র পার্থক্য ছিল যে, একজন (আযান দিয়ে মিনার থেকে সিঁড়ি বেয়ে) নামতেন আর একজন উঠতেন। (বুখারী)

সেহরী

আরবী 'সাহারী' শব্দ থেকে সেহরী এসেছে। এর অর্থ নিদ্রাভঙ্গ, রাতজাগা, ঘুম থেকে উঠা ইত্যাদি। রোযা পালনের নিয়তে সুবহে সাদিকের পূর্বে যে পানাহার করা হয়, তাকে সাহরী বলে। আর এ খাবার রাত জেগে শেষ খাওয়া বলেই একে সেহরী বলে। সেহরী খাওয়া সুন্নাত।

তাড়াতাড়ি সেহরী খাওয়া

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنْتُ اَتَسَحَّرُ فِىْ اَهْلِىْ ثُمَّ يَكُوْنُ سُرْعَتِىْ اَنْ اُدْرِكَ السُّحُوْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বাড়ীতে পরিবার- পরিজনদের মধ্যে সেহরী খেতাম। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ফজরের নামায পড়ার জন্য তাড়াহুড়া করে খেতাম। (বুখারী)

সেহরীর সময়

সেহরী খাওয়ার সময় প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ص ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ -

"তোমরা পানাহার কর রাতের কাল রেখার বুক চিরে সুবহে সাদিকের সাদা রেখা সুস্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে ফুটে উঠার পূর্ব পর্যন্ত। অত:পর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)

www.amarboi.org

আল্লামা আলী কারীর মতে, সেহরীর সময় রাতের অর্ধাংশের পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত।

আল্লামা যামাখশারীর মতে, রাতের ছয় ভাগের শেষ ভাগ সেহরীর সময় হিসেবে বিবেচিত হয়।

সেহরীর উদ্দেশ্য

সেহরীর উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষুধার যাতনা নিবারণ, ইবাদতের শক্তি অর্জন এবং আহলে কিতাব ও বিধর্মীদের বিরোধিতা। রাসূল (সা.) বলেন ঃ "আমাদের ও কিতাবীদের (ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের) রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সেহরী খাওয়া।" (মুসলিম)

মুসলমানদের ও বিধর্মীদের রোযার মূল পার্থক্য হচ্ছে সেহরী। কখনো কখনো তারা রোযা রাখে কিন্তু সেহরী খায় না।

সেহরীর ফযীলত

রোযার সেহরী খাওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা সেহরী খাওয়ার বিধান রেখেছেন। রাসূল (সা.) বলেন ঃ

تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السُّحُوْرِ بَرَكَةً –

"তোমরা শেষ রাতে খানা খাও। তাতে বরকত রয়েছে।" (বুখারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, দিনে রোযার জন্য সেহরী খাবারের সাহায্য নাও এবং রাতের নামাযের জন্য দুপুরের নিদ্রাবিহীন বিশ্রাম গ্রহণ করো। (ইবনে মাজাহ)

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেছেন এক ঢোক পানি অথবা একটি খেজুর অথবা কিশমিশের একটি দানা হলেও তোমরা সেহরী খাও। কারণ যারা সেহরী খায় ফেরেশতাগণ তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন। (তাবারানী, আহমদ)

সেহরী খাওয়াতে তিনটি লাভ :

১. রাসূলের সুন্নাতের উপর আমল।

২. আহলে কিতাব ও বিধর্মীদের রোযার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি।

৩. ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভ।

www.amarboi.org

সেহরীর মাসাইল

১. সেহরী দেরী করে খাওয়া উত্তম। তবে এতো বেশী দেরী করা ঠিক নয়। যাতে সুবহে সাদিক হয়ে যেতে পারে। (হিদায়া)

২. কেউ যদি রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হতে না পারার কারণে সেহরী খেতে না পারে, তবে তাকে না খেয়েই রোযা রাখতে হবে। এজন্য রোযা ছেড়ে দিতে পারবে না। (হিদায়া)

৩. কোন ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে রাত আছে মনে করে সেহরী খায় এবং পরে জানতে পারে যে, তখন রাত ছিল না, সুবহে সাদিক হয়ে গেছে, তাহলে ঐ রোযা শুদ্ধ হবে না। ঐ রোযার পরিবর্তে আরো একটি রোযা কাযা করতে হবে। কাফফারা দিতে হবে না। তবে রোযা না হলেও দিনের বেলা রোযাদারের ন্যায় থাকতে হবে। (হিদায়া)

৪. সেহরীর সময় কেউ যদি কোন খানা না খেয়ে সামান্য পানিও পান করে, তুবও তার সেহরী খাওয়ার সওয়াব হবে।

সেহরী ও ফজরের নামাযের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান হওয়া দরকার

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ السُّحُوْرِ وَالاَذَانِ قَالَ قَدْرُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً -

যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সেহরী খেয়েছি। তারপর তিনি নামায পড়তে দাঁড়িয়েছেন। (বর্ণনাকারী আনাস বলেন,) আমি যায়েদ ইবনে সাবিতকে জিজ্ঞেস করলাম, সেহরী ও আযানের মাঝখানে কত সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশটি আয়াত পড়ার মত সময়ের ব্যবধান ছিল। (বুখারী)

সেহরী খাওয়াতে বরকত ও কল্যাণ লাভ হয়। তবে সেহরী খাওয়া ওয়াজিব নয়। কেননা, নবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের ক্রমাগতভাবে রোযা রাখা সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সেহরীর উল্লেখ নেই।

www.amarboi.org

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّىْ اَظَلُّ اُطْعَمُ وَاُسْقَى -

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। কোন এক সময়ে নবী (সা.) একাধারে (সাওমে বিছাল) রোযা রাখতে থাকলে লোকেরাও (সাহাবীগণ) একাধারে রোযা রাখতে শুরু করলো কিন্তু তা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালে নবী (সা.) তাদেরকে নিষেধ করলেন। সবাই বললো, আপনি যে একাধারে রোযা রাখছেন ? তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) পানাহার করান হয়ে থাকে। (বুখারী)

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السُّحُوْرِ بَرَكَةً -

আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা সেহরী খাও সেহরীতে বরকত লাভ হয়। (বুখারী)

দিনের বেলায় নফল রোযার নিয়ত করা

উম্মুদ্‌দারদা বর্ণনা করেছেন যে,. আবুদ্‌দারদা (কোন কোন সময়) এসে তাকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার কাছে খাবার কোন ব্যবস্থা আছে কি, যদি আমি বলতাম, 'না', তখন তিনি এই বলে রোযা রাখতেন যে, তাহলে আমি আজকে রোযা রাখলাম। আবু তালহা, আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাস ও হুযায়ফা (রা.)-ও এভাবে রোযা রেখেছেন।

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَعِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ نَاسًا يُنَادِىْ فِى النَّاسِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ اَنَّ مَنْ اَكَلَ فَلْيُتِمَّ وَمَنْ لَمْ يَاْكُلْ فَلاَ يَاْكُلْ -

www.amarboi.org

সালামা ইবনুল আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। আশূরার দিন নবী (সা:) লোকদের এ কথা প্রচার করার জন্য একজন লোককে পাঠালেন, যে ব্যক্তি আজ খাবার খেয়ে নিয়েছে সে যেন (সন্ধ্যা পর্যন্ত) আর না খায়, রোযা রাখে। আর যে এখনো খাবার খায়নি সে যেন আর না খায় (এবং রোযা রাখে)। (বুখারী)

রোযাদার ফজরের সময় পর্যন্ত নাপাক অবস্থায় থাকতে পারে

عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِّنْ اَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ اُقْسِمُ بِاللّٰهِ لَتَفْزَعَنَّ بِهَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَانَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَرِهَ ذٰلِكَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا اَنْ نَجْتَمِعَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَكَانَتْ لاَبِىْ هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ اَرْضٌ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لاَبِىْ هُرَيْرَةَ اِنِّىْ ذَاكِرٌ لَّكَ اَمْرًا وَلَوْلاَ اَنَّ مَرْوَانَ اَقْسَمَ عَلَىَّ فِيْهِ لَمْ اَذْكُرْهُ لَكَ فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ كَذٰلِكَ حَدَّثَنِىْ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ اَعْلَمُ وَقَالَ هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُ بِالْفِطْرِ وَالاَوَّلُ اَسْنَدُ ـ

মারওয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত। আয়েশা ও উম্মু সালামা তাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তার স্ত্রীর সাথে সহবাসজনিত নাপাকী নিয়ে রাত্রিতে নিদ্রা

www.amarboi.org

যেতেন এবং এ অবস্থায়ই নিয়ত করে রোযা রাখতেন। এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে মারওয়ান আবদুর রহমান ইবনে হারেসকে বললেন আমি আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, এ হাদীস শুনিয়ে তুমি আবূ হুরায়রাকে আতঙ্কিত করে দাও। কেননা, এরূপ রোযাদারের রোযা হয় না বলে তিনি ফতোয়া দিয়ে থাকেন। সেই সময় মারওয়ান ছিলেন মদীনার গভর্নর। হাদীসের বর্ণনাকারী আবূ বকর বলেন, আবদুর রহমান বিষয়টিকে খারাপ মনে করলেন। এরপর ভাগ্যক্রমে যুলহুলায়ফা নামক জায়গায় সবাই জুটে গেলাম। সেখানে আবূ হুরায়রার একখণ্ড জমি ছিল। (এ সুযোগে) আবদুর রহমান আবূ হুরায়রাকে বললেন, আমি আপনাকে একটি কথা বলতে চাই। মারওয়ান বিষয়টি সম্পর্কে আমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে না বললে আমি আপনাকে তা বলতাম না। এরপর তিনি আয়েশা ও উম্মু সালামার বর্ণিত হাদীস বললেন এবং এ কথাও বললেন যে, ফযল ইবনে আব্বাসও আমাকে এমনি হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। আর তিনি সবচেয়ে বেশী অবহিত। হাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে নবী (সা.) রোযা ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিতেন। তবে প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতটির সনদই মযবুত। (বুখারী)

সংগম ছাড়া স্ত্রীর সাথে রোযাদারের সব রকমের মেলামেশা জায়েয। আয়েশা বলেছেন, রোযাদারের জন্য স্ত্রীর গোপন অংগ হারাম।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ اَمْلَكُكُمْ لاِرَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِرَبٌ حَاجَةٌ وَقَالَ طَاوُسٌ غَيْرِ اُوْلِى الاِرَبَةِ وَالاَحْمَقِ لاَ حَاجَةَ لَهُ فِى النِّسَاءِ -

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রোযা অবস্থায় নবী (সা.) (স্ত্রীদেরকে) চুম্বন ও স্পর্শ করতেন। তবে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে তোমাদের সবার চেয়ে তাঁর বেশী ক্ষমতা ছিল। ইবনে আব্বাস বলেছেন

www.amarboi.org

'ইরাব' অর্থ হল 'প্রয়োজন' বা আবশ্যকীয় বস্তু। আর তাউস বলেছেন, (কুরআন মাজীদের), غير اولى الاربة অর্থ হলো তারা ঐ আহ্মক (নির্বোধ), যাদের স্ত্রীলোকের প্রয়োজন হয় না। (বুখারী)

রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া। জাবির ইবনে যায়েদ বলেছেন, কামদৃষ্টি দিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালে যদি বীর্যপাত ঘটে, তবু রোযা রাখবে এবং পূর্ণ করবে।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ اَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ ـ

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রোযা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে চুমু দিতেন। তারপর (এ কথা বলে) তিনি (আয়েশা) হেসে দিলেন। (বুখারী)

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّهَا قَالَتْ بَيْنَمَا اَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْخَمِيْلَةِ اِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ حَيْضَتِىْ فَقَالَ مَالَكِ اَلَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِى الْخَمِيْلَةِ وَكَانَتْ هِىَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ ـ

যায়নাব বিনতে উম্মু সালামা (রা.) তার মা (উম্মু সালামা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (উম্মু সালামা) বলেছেন, কোন এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে একই চাদরের নিচে শুয়েছিলাম। এমন সময় আমার মাসিক শুরু হলে আমি হায়েযের কাপড় গুটিয়ে চুপে চুপে বের হলাম। তিনি [নবী (সা.)] জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, তোমার মাসিক শুরু হয়েছে ? আমি বললাম, 'হাঁ'। এরপর তাঁর সাথে একই চাদরে শয়ন করলাম। আর তিনি (উম্মু সালামা) এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) (পবিত্রতা

www.amarboi.org

অর্জনের জন্য) একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) রোযাদার অবস্থায় তাকে চুমু দিতেন। (বুখারী)

রোযাদারের গোসল করা

রোযা অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) একখানা কাপড় ভিজিয়ে গায়ে জড়িয়েছেন। রোযা অবস্থায় ইমাম শা'বী হাম্মামখানায় গিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, রোযা থেকে উনুনের খাদ্য বা অন্য কোন জিনিসের আস্বাদনে কোন দোষ নেই। হাসান বসরী বলেছেন; কুল্লি করা বা শরীর ঠান্ডা করতে রোযাদারের জন্য কোন দোষ নেই। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ রোযা রাখলে সকালে তেল মাখবে ও চিরুনি করবে (যাতে শরীর ভালো থাকে)। আনাস বলেছেন, আমার একটি চৌবাচ্চা আছে। আমি রোযা রেখে তাতে প্রবেশ করি (অর্থাৎ গোসল করি) রোযা রেখে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) সকাল-সন্ধ্যায় মেসওয়াক করতেন। ইবনে সিরীন বলেছেন, রোযা অবস্থায় কাঁচা রসযুক্ত মেসওয়াক ব্যবহারেও কোন ক্ষতি নেই। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কাঁচা মেসওয়াকের তো স্বাদ আছে ? তিনি বললেন, পানিরও তো স্বাদ আছে ? কিন্তু পানি দিয়ে সবাই কুল্লি করে। আনাস, হাসান বসরী এবং ইবরাহীম নাখঈ রোযাদারের সুরমা ব্যবহারে কোন ক্ষতি আছে বলে মনে করেন না।

عَنْ عُرْوَةَ وَاَبِىْ بَكْرٍ قَالاَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِىْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ -

উরওয়া ইবনে যুবায়ের ও আবূ বকর (রা.) (উভয়) থেকে বর্ণিত। আয়েশা বলেছেন, রমযনে মাসে ইহতিলাম ছাড়াই নবী (সা.)-এর গোসলের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় ফজরের ওয়াক্ত হয়ে আসতো। তখন তিনি গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন। (বুখারী)

www.amarboi.org

عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاَبِىْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَائِشَةَ قَالَتْ اَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ اِحْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُوْمُهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى اُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ ـ

আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমান (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি এবং আমার পিতা চললাম এবং আয়েশার কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। তিনি (আয়েশা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি স্বপ্নদোষের কারণে নয় সহবাসের কারণে ফরয গোসলের প্রয়োজন নিয়ে ফজর পর্যন্ত থেকেছেন, তারপর রোযা রেখেছেন। পরে আমরা সেখান থেকে উম্মু সালামার কাছে গেলাম তিনিও অনুরূপ কথাই বললেন। (অর্থাৎ হযরত আয়েশা যা বলেছিলেন তিনিও তাই বললেন)। (বুখারী)

রোযাদার ভুলবশত: কিছু খেলে বা পান করলে তার হুকুম

আতা বলেছেন, নাকে পানি দিতে গিয়ে তা কণ্ঠনালীতে প্রবেশ করলে ক্ষতি নেই যদি বের করে আনতে নাও পারে। হাসান বসরী বলেছেন, কণ্ঠনালীতে মাছি প্রবেশ করলে কিছুই হবেনা। হাসান বসরী ও মুজাহিদ বলেছেন, ভুল করে সংগম করে ফেললেও কিছু হবে না।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نَسِىَ فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ ـ

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, রোযাদার যদি ভুল করে খায় বা পান করে, তাহলে সে (ইফতার না করে) রোযা পূর্ণ করবে। কেননা, আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন। (বুখারী)

www.amarboi.org

রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করা

আমের ইবনে রাকিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি এতো অধিককাল নবী (সা.)-কে রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করতে দেখেছি যে, সংখ্যা নির্ণয় করা মুশকিল। আবূ হুরায়রা নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) বলেছেন, যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে প্রতিবার উযুর সময়ই সবাইকে মেসওয়াক করতে আদেশ করতাম। জাবির ও যায়েদ ইবনে খালেদের মাধ্যমে নবী (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনাই পাওয়া যায়। তবে এখানে রোযাদার ও অরোযাদারের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হয়নি। আয়েশা নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মেসওয়াক মুখকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্নকারী এবং মহান প্রভু আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানকারী। আতা ইবনে আবী রাবাহ ও কাতাদাহ বলেছেন, রোযাদারের জন্য থুথু বা লালা গিলে খাওয়া জায়েয।

রমযান মাসে রোযা রেখে সংগম করে ফেললে কাফফারা আদায় করতে হয়

عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ اِنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّهُ اِحْتَرَقَ قَالَ مَالَكَ قَالَ اَصَبْتُ اَهْلِيْ فِيْ رَمَضَانَ فَاُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقُ فَقَالَ اَيْنَ الْمُحْتَرِقُ قَالَ اَنَا قَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا ـ

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি নবী (সা.)-এর কাছে এসে বললো, সে দোযখের আগুনে দগ্ধ হয়েছে। তিনি [নবী (সা.)] বললেন, কি ব্যাপার তোমার কি হয়েছে ? সে বললো, আমি রমযানের রোযা রেখে স্ত্রীর কাছে গিয়েছি। ইতোমধ্যে নবী (সা.)-এর কাছে একটি ব্যাগভতি খেজুর আসলো যা আরাক নামে পরিচিত। তখন নবী (সা.) তাকে খেজুরগুলো দিয়ে বললেন, এগুলো সাদকা করে দাও। (বুখারী)

www.amarboi.org

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ قَالَ مَالَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى اِمْرَأَتِىْ وَاَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تَعْتِقُهَا قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَجِدُ اِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ قَالَ فَمَكَثَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ اُتِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيْهَا تَمَرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ اَنَا قَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَعَلَى اَفْقَرِ مِنِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهِ يُرِيْدُ الْحَرَّتَيْنِ اَهْلَ بَيْتٍ اَفْقَرَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ اَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اَطْعِمْهُ اَهْلَكَ ـ

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সা.)-এর কাছে বসেছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। নবী (সা.) বললেন, কি ব্যাপার, তোমার কি হয়েছে? সে বললো, আমি রোযা অবস্থায় স্ত্রীগমন করেছি। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি ক্রমাগতভাবে ষাটটি রোযা রাখো। সে বললো, আমি তা রাখতে অক্ষম। তিনি বললেন ঃ তোমার কাছে কি কোন ক্রীতদাস আছে তাকে আযাদ করে দিতে পারে? সে বললো, 'না'।

www.amarboi.org

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে কি ? সে এবারও বলল না। আবূ হুরায়রা বলেছেন, নবী (সা.) কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকলেন। আমরা এ অবস্থায় বসে থাকতে থাকতেই নবী (সা.)- এর কাছে একটি থলিভতি খেজুর আনীত হল যা ওযনদার ছিল। তখন নবী (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, প্রশ্নকারী কোথায় ? লোকটি বললো হাঁ, আমি আছি। নবী (সা.) তাকে বললেন, এগুলো নিয়ে যাও এবং সাদকা করে দাও। লোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার চাইতেও অভাবী লোককে সাদকা করে দিবো? আল্লাহর কসম, (মদীনার) দুটি কংকরময় ভূমির মধ্যস্থিত স্থানে আমার পরিবারের চাইতে বেশী অভাবী পরিবার আর একটিও নাই। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) হেসে দিলেন এমনকি তাঁর সামনের দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে পড়লো। তখন তিনি [নবী (সা.)] বললেনঃ তাহলে তোমার পরিবারকে খেতে দাও। (বুখারী)

সফরে রোযা রাখতে হবে কিনা

عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ قَالَ لِرَجُلٍ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلشَّمْسُ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلشَّمْسُ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ هٰهُنَا ثُمَّ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ اَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ -

ইবনে আবূ আওফা (রা.) বর্ণনা করেছেন। এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। (সন্ধ্যায়) তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, সওয়ারী থেকে নামো এবং আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আনো। সে বললো, হে আল্লাহর রসূল! সূর্যের আলো তো এখনো অবশিষ্ট আছে। তিনি [রসূলুল্লাহ

www.amarboi.org

(সা.)] বললেন, সওয়ারী হতে অবতরণ করো এবং আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে আবারও বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এখনো তো সূর্যের কিরণ অবশিষ্ট আছে। তিনি [রাসূলুল্লাহ (সা.)] আবারও বললেন ঃ নামো এবং আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আনো। তখন সে সওয়ারী হতে নেমে ছাতু গুলিয়ে আনলে তিনি তা খেলেন এবং হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, এখানে অর্থাৎ যখন দেখবে যে, এখন রাতের অন্ধকার শুরু হয়ে ঘনিয়ে আসছে, তখন বুঝবে রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে গিয়েছে। (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ هَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الاَسْلَمِيِّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصُوْمُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيْرَ الصِّيَامِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ ـ

নবী (সা.)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) হামযা ইবনে আমর আল-আসলামী অধিক মাত্রায় রোযা রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নবী (সা.) কে বললেন, আমি সফরে রোযা রেখে থাকি। নবী (সা.) বললেন ঃ সফর অবস্থায় তুমি ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পারো আবার ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পারো। (অর্থাৎ সফরে দুটিরই অনুমতি আছে।) (বুখারী)

রমযান মাসে কয়েকটি রোযা রাখার পর সফরে বের হলে তার হুকুম

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اِلَى مَكَّةَ فِيْ رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيْدَ اَفْطَرَ فَاَفْطَرَ النَّاسُ ـ

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ (সা.) রোযা রেখে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন।

www.amarboi.org

কাদীদ নামক জায়গায় পৌছে তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেললে সবাই রোযা ভেঙ্গে ফেললো। (বুখারী)

ইবনে আব্বাস বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সফরে কখনো রোযা রেখেছেন আবার কখনো ভঙ্গ করেছেন। সুতরাং কেউ ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পারে আবার ইচ্ছা করলে রোযা ভঙ্গ করতে পারে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هٰذَا فَقَالُوْا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ -

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন এক সফরে থাকা অবস্থায় এক জায়গায় জটলা দেখতে পেলেন। তার মধ্যে একজন লোককে সবাই ছায়া করে রয়েছে, সে বেহুশ হয়ে পড়েছে। তিনি বললেন, কি হয়েছে। লোকজন বললো, লোকটি রোযা রেখেছে। এসব শুনে তিনি বললেন, সফরে রোযা রাখা কোন নেকীর কাজ নয়। (বুখারী)

সফরে রোযা রাখা না রাখা নিয়ে নবী (সা.)-এর সাহাবীগণ পরস্পরের দোষক্রটি বলতেন না। নিন্দাবাদ করতেন না।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ -

আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা অনেক সময় (রমযান মাসে) নবী (সা.)-এর সাথে সফরে থাকতাম। আমাদের মধ্যে যারা রোযা রাখতেন, তারা কখনো অরোযাদারদের আর যারা রোযা রাখতেন না তারা কখনো রোযাদারদের দোষক্রটি ও নিন্দবাদ করতেন না। (বুখারী)

www.amarboi.org

ঋতু অবস্থায় মেয়েরা নামায ও রোযা করবে না

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَيْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا ـ

আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, এটা কি ঠিক নয় যে, হায়েয শুরু হলে মেয়েরা নামায পড়তে বা রোযা রাখতে পারে না ? আর দ্বীনের ব্যাপারে এটাই তাদের কমতি। (বুখারী)

কোন মৃত ব্যক্তির ফরয রোযা থাকলে সে ক্ষেত্রে হাসান বসরী বলেছেন যে, একই রোযা ত্রিশজন লোক তার পক্ষে থেকে আদায় করে দিলে জায়েয হবে।

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَّاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ـ

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ কোন মৃত ব্যক্তির উপর কাযা রোযা থাকলে ঐ লোকের অভিভাবক তার পক্ষ থেকে তা আদায় করবে। (বুখারী)

হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব কর্তৃক আমর থেকে এবং ইয়াহইয়া ইবনে আয়্যুব কর্তৃক ইবনে আবূ জাফর থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ اَفَاَقْضِيْهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ يُّقْضَى ـ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী (সা.)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমার মা মৃত্যুবরণ

www.amarboi.org

করেছেন। তাঁর এক মাসের রোযা কাযা আছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে তা আদায় করবো ? নবী (সা.) বললেন, হাঁ, আল্লাহর ঋণ পরিশোধিত হওয়ার বেশী হকদার। (বুখারী)

ইফতার

ইফতারের মূল শব্দ 'ফুতুর' অর্থ নাশ্‌তা বা হাল্‌কা খাবার গ্রহণ। পরিভাষায় রোযাদার কর্তৃক দিনের শেষে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর রোযার সমাপ্তির জন্যে কিছু খাবার গ্রহণ করাকে 'ইফতার' বলে।

অবিলম্বে ইফতার করা

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ -

সাহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যতদিন লোকেরা সূর্য অস্ত যাওয়ার পর অনতিবিলম্বে ইফতার করবে, ততদিন পর্যন্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না। (বুখারী)

عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَصَامَ حَتَّى اَمْسَى ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ قَالَ لَوْ اِنْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِىَ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ اِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ اَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ -

ইবনে আবূ আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক সফরে আমি নবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। তিনি [নবী (সা.)] রোযা ছিলেন। সন্ধ্যা হলে তিনি এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি গিয়ে আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আনো। সে বললো আপনি সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তিনি বললেন, তুমি (সওয়ারী থেকে নেমে) গিয়ে আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে

www.amarboi.org

আনো। যখন দেখবে রাতের অন্ধকার এদিক (পূর্বদিক) থেকে ঘনিয়ে আসছে তখন বুঝবে রোযাদারের ইফতারের সময় হয়েছে। (বুখারী)

ইফতারের দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

অর্থ : হে আল্লাহ তোমার জন্যে রোযা রাখছি এবং তোমার দেয়া রিয্ক দিয়ে ইফতার করছি।

ইফতারের মাসাইল

১. সূর্যাস্তর সাথে সাথে ইফতার করা মুস্তাহাব। দেরী করা মাকরূহ। (ফাতহুল কাদীর)

২. মেঘের দিনে কিছু বিলম্ব করে নিশ্চিত হয়ে ইফতার করা উত্তম।

৩. যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যাস্ত সম্বন্ধে সামান্যও সন্দেহ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইফতার করা জায়েয নয়।

ইফতারের আদব

১. সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার গ্রহণ করা।

২. খেজুর অথবা পানি দ্বারা ইফতার গ্রহণ করা।

৩. মাগরিবের নামায পড়তে দেরী না করা।

ইফতারের ফযীলত

প্রত্যেকটি মুসলমানের নিকট ইফতারের গুরুত্ব অপরিসীম। সারাদিন রোযা রেখে তারা দিন শেষে ইফতার করে শারীরিক শক্তি অর্জন, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন ও অনাবিল শান্তি লাভ করেন। রাসূল (সা,) বলেন ঃ "রোযাদারের জন্য দুটি খুশী বা আনন্দের সুখবর। একটি হচ্ছে ইফতারের সময় আর অপরটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ তিনটি কাজ পসন্দ করেন যথাঃ

www.amarboi.org

১. তাড়াতাড়ি ইফতার করা ২. দেরীতে সেহরী খাওয়া ৩. নামাযে এক হাতের উপর অন্য হাত রেখে দাঁড়ানো। (তাবারানী)

রাসূল (সা.) বলেছেন : দ্বীন ততক্ষণ জয়ী থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা শীঘ্র ইফতার করবে। কেননা ইয়াহূদী ও নাসারাগণ দেরীতে ইফতার করে। (আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ)

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ যখন রাত্রি পূর্ব দিক থেকে আসে এবং দিন পশ্চিম দিকে চলে যায় আর সূর্যাস্ত হয়, তখন রোযাদার যেন ইফতার করে নেয়। (বুখারী, মুসলিম)

রোযাদারকে ইফতার করানোর ফযীলত

রাসূল (সা.) বলেন : যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, তার জন্য এটি মাগফিরাত ও মুক্তির মাধ্যম হবে।

অপর এক হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায় তার জন্য রয়েছে ঐ রোযাদারের সমান সওয়াব। তবে ঐ রোযাদারের সওয়াব থেকে কোন কিছু ঘাটতি হবে না। (ইবনে মাজাহ, আহমদ, নাসাঈ, তিরমিযী)

রাসূল (সা.) বলেন: রমযান মাসে যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করায় তখন এ ইফতার তার গুনাহ মাফের এবং জাহান্নামের আগুন থেকে তার মুক্তির কারণ হয় এবং সেই সাথে সে তত্তটাই সওয়াব পাবে। তার সওয়াব কোন অংশে কম হবে না। সাহাবীগণ বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা (দরিদ্র হওয়ায়) এমন কিছু পাই না যা দিয়ে রোযাদারকে ইফতার করাবো ? তখন রাসূল (সা.) বললেন : যে ব্যক্তি এক ঢোক দুধ দিয়ে কিংবা একটি খেজুর দিয়ে অথবা এক ঢোক পানি দিয়ে কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে আল্লাহ তাআলা তাকে পূর্ণ মাত্রায় সে সওয়াবই দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে পেট ভরে খাওয়াবে তাকে আল্লাহ আমার হাওযে কাওছারের এক ঢোক পানি পান করাবেন। ফলে জান্নাতে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত সে আর পিপাসিত হবে না । (ইবনে খোযায়মা)

www.amarboi.org

সাওমে বেসালের বিধান

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الوِصَالِ قَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّىْ لَسْتُ مِثْلَكُمْ اِنِّىْ اُطْعَمُ وَاُسْقَى -

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সাওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন। এতে সাহাবীগণ সবাই বলেছিল, আপনিতো সাওমে বেসাল করে থাকেন। তিনি বলেছিলেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়, আমাকে খাওয়ানো ও পান করানো হয়। (বুখারী)

একাধারে না খেয়ে না পান করে (সেহরী ইফতারী না করে) রোযা রাখাকে সাওমে বেসাল বলে। এটি উম্মতের জন্য নিষিদ্ধ। রাসূল (সা.)-এর জন্য সাওমে বেসাল রাখা জায়েয ছিল।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُوَاصِلُ فَاَيُّكُمْ اَرَادَ اَنْ يُّوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّىْ اَبِيْتُ لِىْ مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِىْ وَسَاقٍ يَسْقِيْنِىْ -

আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, তোমরা সাওমে বেসাল করো না। (অর্থাৎ খেয়ে রোযা রাখ) সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো সাওমে বেসাল করে থাকেন? তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমি রাত্রি যাপন করি, যে আমার খাওয়ার ও পানীয় দাতা আছেন তিনিই আমাকে খাওয়ান ও পান করান। (বুখারী)

www.amarboi.org

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالوِصَالَ مَرَّتَيْنِ قِيْلَ اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّىْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِىْ رَبِّىْ وَيَسْقِيْنِىْ فَاكْلَفُوْا مِنَ الاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ -

আবূ হুরায়য়া (রা.) নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা সাওমে বেসাল থেকে বিরত থাকো দুইবার বললেন। তাকে বলা হলো, আপনি তো সাওমে বেসাল রাখেন! তিনি বললেন, আমি (এমন অবস্থায়) রাত্রি যাপন করি যে, আমার রব আমাকে পানাহার করান। তাই তোমরা আমলের ক্ষেত্রে শক্তি- সামর্থ অনুপাতে কঠোরতা কর। (বুখারী)

রোযার প্রকার ও রোযা রাখার নিষিদ্ধ দিন

রোযা ছয় প্রকার– যথা

১. ফরয- যেমন রমযানের রোযা।

২. ওয়াজিব- যেমন মান্নত ও কাফফরার রোযা।

৩. সুন্নত- যেমন মুহাররমের ৯ ও ১০ তারিখের রোযা। আরাফার (৯ই যিলহজ্জের রোযা। আইয়ামে বীর্য বা প্রতি চন্দ্রমাসে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা।

৪. নফল যেমন শাওয়ালের ছয়টি রোযা, সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযা, যিলহজ্জ মাসের প্রথম ৮ই রোযা ইত্যাদি।

৫. মাকরূহ, যেমন শুধু শনিবার রোযা রাখা। স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা, সাওমে বেসাল বা বিরতিহীনভাবে দীর্ঘদিন রোযা রাখা।

৬. হারাম রোযা, যেমন দুই ঈদের দিন রোযা রাখা এবং ঈদুল আযহার পরের তিন দিন রোযা রাখা। বছরে এ পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম। (আসান ফিকাহ)

www.amarboi.org

ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা

عَنْ اَبِىْ عُبَيْدٍ مَّوْلَى ابْنِ اَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْاٰخَرُ تَأْكُلُوْنَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ -

ইবনে আযহারের গোলাম আবূ উবায়দ থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি ঈদের দিন উমর ইবনে খাত্তাবের সংগে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন- এক হলো ঈদুল ফিতরের দিন আর দ্বিতীয় হলো, যেদিন তোমরা কোরবানীর গোশ্‌ত খেয়ে থাকো। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَعَنِ الصَّهَاءِ وَاَنْ يَّحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَعَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ -

আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল ফিতর ও কোরবানীর ঈদের দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও যা নিষেধ করেছেন, তা হলো চাদর ইত্যাদি এমনভাবে গায়ে জড়িয়ে দেয়া যাতে হাত বের করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং এক কাপড় পরিহিত অবস্থায় হাঁটু খাড়া না করা যাতে তলদেশ উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর ফজর ও আসর নামায পড়ার পর আর কোন নামায না পড়া। (বুখারী)

ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ

www.amarboi.org

الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ -

আবূ হুরায়য়া (রা.) বর্ণনা করেছেন, দু'ধরনের রোযা এবং দু'রকমের বেচাকেনা নিষিদ্ধ হয়েছে। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখা এবং মুলামাসা ও মুনাবাযার বেচাকেনা। (বুখারী)

আইয়ামে তাশরীকের রোযা

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ كَانَتْ عَائِشَةَ تَصُوْمُ اَيَّامَ مِنَى وَكَانَ اَبُوْهُ يَصُوْمُهَا -

হিশাম ইবনে উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা.) মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে রোযা রাখতেন এবং তাঁর পিতা উরওয়াও এই দিনগুলোয় রোযা থাকতেন। (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يُرَخَّصْ فِىْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ اَنْ يُّصُمْنَ اِلاَّ لِمَنْ لَّمْ يَجِدِ الْهَدْىَ -

আয়েশা (রা.) ও ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, আইয়ামে তাশরীকের রোযা রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি। তবে যার নিকট কোরবানীর জানোয়ার নেই (তার জন্য অনুমতি আছে) । (বুখারী)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَلصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ اِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ اَيَّامَ مِنَى -

ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জকে উমরার সাথে মিলিয়ে তামাত্তু করে তার জন্য আরাফাতের দিন পর্যন্ত রোযা রাখার অনুমতি রয়েছে। আর যদি তার কোরবানীর জানোয়ার না থাকে এবং সে রোযা রাখেনি, তাহলে সে মিনার দিনগুলোয় রোযা রাখতে পারে। (বুখারী)

www.amarboi.org

আরাফতের দিন রোযা রাখা

عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِىْ صَوْمِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَاَرْسَلَتْ اُمُّ الْفَضْلِ اِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيْرَةٍ فَشَرِبَهُ ـ

হারিস-তনয়া উম্মুল ফযল (রা.) থেকে বর্ণিত। আরাফাতের দিন লোকজন তাঁর কাছে নবী (সা.) এর রোযা (রাখা না রাখা) সম্পর্কে বিতর্ক করছিল। তাদের কেউ কেউ বলল, তিনি রোযা রেখেছেন। অন্যরা বললো, তিনি রোযা রাখেননি। তখন উম্মুল ফযল নবী (সা.)-এর খেদমতে এক পিয়ালা দুধ পাঠালেন। তিনি উটের উপর বসা অবস্থায় ছিলেন, দুধটুকু তখনি তিনি পান করে ফেললেন। (বুখারী)

আশূরার দিনের রোযা

عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ اِنْ شَاءَ صَامَ ـ

সালম (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সা.) বলেছেন আশূরার দিন কেউ ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পারে। (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ ـ

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ (সা.) (প্রথমত) আশূরার দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন রমযানের রোযা ফরয করা হলো,

www.amarboi.org

তখন যার ইচ্ছা হতো রোযা রাখতো, আর যার ইচ্ছা হতো না সে রোযা রাখতো না। (বুখারী)

عَنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ـ

যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, কুরায়শরা জাহিলিয়াতের যুগে আশূরার দিন রোযা রাখতো। জাহিলিয়াতের যুগে রাসূলুল্লাহ (সা.)-ও এই দিন রোযা রাখতেন। (হিজরত করে) তিনি যখন মদীনায় আসেন, তখনও (প্রথমত) তিনি এ রোযা রেখেছেন এবং তা রাখার নির্দেশও দিয়েছেন। কিন্তু যখন রমযানের রোযা ফরয হলো, তখন আশূরার দিন রোযা রাখা ছেড়ে দেয়া হলো। যার ইচ্ছা রোযা রাখতো এবং যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিতো। (বুখারী)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ عَامَ حَجٍّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَيْنَ عُلَمَاءُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هٰذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَاَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ ـ

মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান (রা.) যে বছর হজ্জ করেছিলেন, মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, হে মদীনাবাসী, তোমাদের আলেমগণ কোথায় ? আমি

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, এটি আশূরার দিন। আল্লাহ তোমাদের উপর এ দিন রোযা রাখা ফরয করেননি। আমি রোযা রেখেছি তাই যার ইচ্ছা রোযা রাখতে পারে। আর যার ইচ্ছা নাও রাখতে পারে। (বুখারী)

তারাবীর নামায

রমযান মাসে ইশার চার রাকআত ফরয ও দুই রাকআত সুন্নাত নামাযের পর এবং বিতের নামাযের পূর্বে যে নামায পড়া হয় তাকে সালাতুত তরাবীহ বা তারাবীহর নামায বলে।

তারবীহ (تراويح) শব্দের মূল ধাতু হচ্ছে রাহাতুন (راحة)। এর অর্থ আরাম বা বিশ্রাম করা। এ কারণে প্রতি চার রাকআতের পর কিছু সময় বিশ্রাম বা আরামের প্রয়োজন হয়। তাই একে তারাবীহর বা বিশ্রামের নামায বলা হয়।

রমযানে তারাবীহর নামাযের ফযীলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি রমযান (-এর রাত্রে তারাবীহর নামাযে) ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের নিয়তে দাঁড়ায়, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (বুখারী)

তারাবীহর নামায এক বৈশিষ্টমন্ডিত বিশেষ নামায, যা অন্য কোন নফল নামাযে পাওয়া যায় না। আবদুল্লাহ ইবন আমর থেকে বর্ণিত, কিয়ামতের দিন রোযা ও রাত্রের নামায বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে আমার রব! আমি তাকে দিনে পানাহার থেকে বিরত রেখেছি। তার ব্যাপারে আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দিন। কুরআন বলবে আমি

www.amarboi.org

তাকে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দিন। তারপর তাদের উভয়কে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। (আহমদ)

তারাবীহ্ নামাযের হুকুম

হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ ও ইয়াযীদ ইবনে রোমান (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে সাহাবায়ে কিরাম বিশ রাকআত তারাবীহ্ নামায পড়তেন। (মুয়াত্তা মালিক)

তারাবীহর নামায বিশ রাকআত। বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন বর্ণনা থাকলেও সকল বণনাকে সমণ্বয় সাধন করে বিশ রাকআত নির্ধারিত করা হয়েছে। এর উপর সাহাবীগণের ইজমা প্রতিষ্ঠাই হয়েছে। হানাফীদের নিকট তারাবীর নামায ২০ রাকআত।

আহলে হাদীসগণের নিকট ৮ রাকআত এবং কিছু শাফেঈ মতানুসারীদের নিকট ১১ রাকআত।

ইমাম মালিক, শাফেঈ দাউদ যাহেরী ও আহমদের মতে তারাবীহ্ ২০ রাকআত।

আল্লামা সুয়ূতী বলেন : তারাবীর নামায ২০ রাকাআত এ মাসাইলের উপর চূড়ান্ত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে।

এ নামায দু'দু রাকআতের পর সালাম ফিরাবে এবং প্রত্যেক চার রাকআতের পর এতটুকু সময় বিশ্রাম গ্রহণ করবে যে, সে সময় আরো চার রাকআত নামায পড়া যায়।

তারবীহর বিশ্রামের সময় আমলসমূহ

১. বিশ্রামের সময় বসে থাকা যায়।

২. তাওবা-ইস্তিগফার করা যায়।

৩. কতিপয় ফকীহর মতে নিম্নের দুআ পড়া যায়। যথা :

www.amarboi.org

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَىِّ الَّذِىْ لاَيَنَامُ وَلاَيَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ نَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَنَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ-

অর্থ : বাদশাহী ও শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনি সকল ত্রুটি- বিচ্যুতি ও অক্ষমতা থেকে পাক পবিত্র। পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি সকল সম্মান, শ্রদ্ধা, মহত্ত্ব, ভয়ভীতি, শক্তি, শক্তিমত্তা, বড়ত্ব ও পরাক্রমশালিতার অধিকারী। পবিত্র সেই সত্তা, যিনি চিরজীবিত ও চিরস্থায়ী, যার নিদ্রা ও মৃত্যু নেই। তিনি পাক পবিত্র ও ত্রুটি-বিচ্যুতির উর্ধে। তিনি আমাদের রব এবং ফেরেশতাকুল ও জিবরাঈলের রব প্রভু পরোযারদেগার। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করছি এবং দোযখের আগুন থেকে পানাহ চাচ্ছি। (বুখারী)

তারাবীহর শেষে নিম্নের মুনাজাত পেশ করা যায়

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَاخَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَاكَرِيْمُ يَاسَتَّارُ يَارَحِيْمُ يَاجَبَّارُ يَاخَالِقُ يَابَرُّ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِيْمِيْنَ-

www.amarboi.org

লাইলাতুল কদরের ফযীলত

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- وَمَا اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ-لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ- تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ- سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ-

"নিশ্চয়ই আমি এই (কুরআন) নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে। তুমি জানো লাইলাতুল কদর কি ? কদরের রাত্রি হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। সেই রাতে ফেরেশ্‌তাগণ এবং জিবরাঈল তাদের রবের অনুমতিক্রমে সব রকমের কল্যাণ নিয়ে (দুনিয়ায়) অবতরণ করে থাকেন। সেই রাত্রটি ফজর পর্যন্ত কেবল শান্তিই শান্তি।" (সূরা কদর)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের নিয়তে রমযানের রোযা রাখলো, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের নিয়তে কদরের রাত্রিতে (ইবাদতে) দাড়ালো তার আগেকার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। (বুখারী)

লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ নয় দিনে

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رِجَالاً مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

www.amarboi.org

وَسَلَّمَ أُرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْمَنَامِ فِى التِّسْعِ الاَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِى السَّبْعِ الاَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ يَتَحَرَّهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِى السَّبْعِ الاَوَاخِرِ -

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.)-এর কয়েকজন সাহাবীকে স্বপ্নে (রমযানে) শেষ নয় রাত্রে লাইলাতুল কদর দেখান হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি এটি শেষ সাত রাত্রে সামঞ্জস্যশীল হয়ে গেছে। এজন্য যে ব্যক্তি তা খোঁজ করতে চায়, সে যেন শেষ সাত রাত্রেই তা খোঁজ করে। (বুখারী)

عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا سَعِيْدٍ وَكَانَ لِىْ صَدِيْقًا فَقَالَ اِعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعَشْرَ الاَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجَ صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ اِنِّىْ أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا اَوْ نَسِيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ فِى الْوِتْرِ فَاِنِّىْ رَأَيْتُ اَنِّىْ اَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَطِيْنٍ فَمَنْ كَانَ اِعْتَكَفَ مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِى السَّمَاءِ قَزْعَةً فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتّى سَالَ سُقُفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِّيْنِ حَتّى رَأَيْتُ اَثَرَ الطِّيْنِ فِىْ جَبْهَتِهِ -

www.amarboi.org

আবূ সালামা (রা.) বলেছেন, আমি আবূ সাঈদকে যিনি আমার বন্ধু ছিলেন এক প্রশ্ন করলাম। তিনি জবাব দিলেন, আমরা নবী (সা.)-এর সঙ্গে রমযানের মধ্যের দশ দিনে ই'তিকাফে বসলাম। অত:পর বিশ তারিখের ভোরে নবী (সা.) বেরিয়ে আসলেন, আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আমাকে শবে কদর দেখান হয়েছে। তারপর তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে কিংবা বলেছেন, আমি তা ভুলে গেছি। তোমরা (রমযানের) শেষ দশ দিনের বেজোড় ও অযুগ্ম তারিখে (অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯) লাইলাতুল কদর তালাশ কর, কেননা, আমি দেখতে পেয়েছি যে, আমি স্বয়ং পানি ও কাদায় সিজদা করছি। এজন্য যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে ই'তিকাফে বসেছে- সে যেন ফিরে চলে আসে। সুতরাং আমরা ফিরে চলে এলাম। আমরা আকাশে একখন্ড মেঘও দেখলাম না। হঠাৎ একখণ্ড মেঘ দেখা দিলো এবং বর্ষণ শুরু হলো। এমনকি মসজিদের ছাদ ভেসে গেলো। এ ছাদ খেজুরের ডালে নির্মিত ছিল। অতঃপর নামায পড়া হল। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে পানি ও কাদায় সিজদা করতে দেখলাম। এমনকি আমি তাঁর কপালে কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম। (বুখারী)

রমযানের শেষ দশকে বেজোড় রাত্রে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ -

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্রিতে তালাশ করো। (বুখারী)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعَشْرَ يُجَاوِرُ فِىْ رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِىْ فِىْ

www.amarboi.org

وَسَطِ الشَّهْرِ فَاِذَا كَانَ حِيْنَ يُمْسِىْ مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً تَمْضِىْ وَيَسْتَقْبِلُ اِحْدَى وَعِشْرِيْنَ رَجَعَ اِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ وَاِنَّهُ اَقَامَ فِىْ شَهْرٍ جَاوَرَ فِيْهِ اللَّيْلَةَ الَّتِىْ كَانَ يَرْجِعُ فِيْهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَاَمَرَهُمْ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ اُجَاوِرُ هٰذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ قَدْ بَدَا لِىْ اَنْ اُجَاوِرَ هٰذِهِ الْعَشْرَ الاَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اِعْتَكَفَ مَعِىْ فَلْيَثْبُتْ (فَلْيَلْبَثْ) فِىْ مُعْتَكِفِهِ وَقَدْ اُرِيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا فَابْتَغُوْهَا فِى الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ وَابْتَغُوْهَا فِىْ كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَأَيْتُمُوْنِىْ اَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَطِيْنٍ فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَاَمْطَرَتْ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِىْ مُصَلَّى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ اِحْدَى وَعِشْرِيْنَ فَبَصُرَتْ عَيْنِىْ فَنَظَرْتُ اِنْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُمْتَلِىً طِيْنًا وَمَاءً ـ

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) মাহে রমযানের মধ্যের দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন। যখন বিশ তারিখ অতীত এবং ২১ তারিখ এসে যেতো তখন তিনি স্বগৃহে ফিরে আসতেন। আর যারা তাঁর সাথে ই'তিকাফে বসতো তারাও ফিরে যেতো। একবার রমযানে তিনি সেই রাত্রে ই'তিকাফে ছিলেন, যে রাত্রে সাধারণত তিনি ফিরে চলে যেতেন। তারপর তিনি মানুষের সামনে ভাষণ দান করলেন এবং আল্লাহ যা চেয়েছেন সেমতে তিনি নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বললেন আমি এ দশ

www.amarboi.org

দিনে ই'তিকাফ করতাম। কিন্তু এখন আমার নিকট পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, এ শেষ দশ দিনে ই'তিকাফ করা উচিত। অতএব যারা আমার সাথে ই'তিকাফে বসেছে, তারা যেন নিজেদের ই'তিকাফ করা স্থানে অবস্থান করে। আমাকে স্বপ্নে শবে কদর দেখানো হয়েছে। এরপর তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই তোমরা (রমযানের) শেষ দশ দিনেই তা তালাশ করো। আর তার খোঁজ করো প্রত্যেক বেজোড় রাত্রিতে। আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি পানি ও কাদায় সিজদা দিচ্ছি। সে রাত্রেই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হয়ে ভেসে গিয়েছে এবং নবী (সা.)-এর নামাযের স্থানটিতে পানি গড়িয়ে পড়েছে। এটি ছিল একুশ তারিখের রাত্রি। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, নবী (সা.) ফজরের নামায শেষ করেছেন আর তাঁর চেহারা কাদা ও পানিতে পূর্ণ ছিল। (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِى الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُوْلُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ -

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) রমযনের শেষ দশ দিনে ই'তিকাফে বসতেন এবং বলতেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ দিনে তালাশ করো। (বুখারী)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ فِىْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِىْ تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِىْ سَابِعَةٍ تَبْقَى فِىْ خَامِسَةٍ تَبْقَى -

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ দিনে খোঁজ করো। লাইলাতুল কদর এসব রাত্রিতে আছে যখন (রমযানের) ৯, ৭ কিংবা ৫ রাত বাকী থেকে যায় (অর্থাৎ ২১, ২৩ ও ২৫ তারিখে)। (বুখারী)

www.amarboi.org

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ فِي الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ هِيَ فِيْ تِسْعٍ يَبْقِيْنَ اَوْ فِيْ سَبْعٍ يَبْقِيْنَ يَعْنِيْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ -

ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তা (শবে কদর) শেষ দশ দিনে আছে। যখন নয় রাত অতীত হয়ে যায় কিংবা সাত রাত বাকী থাকে (অর্থাৎ ২৯ কিংবা ২৭ তারিখ)। (বুখারী)

মানুষের ঝগড়া-বিবাদের কারণে লাইলাতুল কদরের পরিচিতি বিলীন হলো

عَنْ عُبَادَةَ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ هِيَ فِي الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ هِيَ فِيْ تِسْعٍ يَبْقِيْنَ اَوْ فِيْ سَبْعٍ يَبْقِيْنَ يَعْنِيْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ -

উবাদা ইবনে সামিত (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) (একদা) আমাদেরকে লাইলাতুল কদর (-এর সঠিক তারিখ) সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য বেরিয়ে এসেছিলেন। এমন সময় দু'জন মুসলমান বিবাদ করতে লাগালো। তখন তিনি বললেন ঃ আমি বের হয়েছিলাম তোমাদেরকে লাইলাতুল কদর (-এর সঠিক তারিখ সম্বন্ধে) খবর দেয়ার জন্য। কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। তাই (এর ইল্ম) আমার থেকে উঠিয়ে নেয়া হলো। সম্ভবতঃ এর মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত ছিল। অতএব তোমরা লাইলাতুল কদরকে (শেষ দশ দিনের) নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাত্রিতে তালাশ কর। (বুখারী)

www.amarboi.org

রমযানের শেষ দশ দিনের আমলের বর্ণনা

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِيْزَرَهُ وَاَحْيَى لَيْلَهُ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ ـ

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, যখন (রমযানের শেষ) দশ দিন এসে যেতো, তখন নবী (সা.) পরনের কাপড় মযবুত করে বাঁধতেন (অর্থাৎ দৃঢ়তার সাথে প্রস্তুতি নিতেন) রাত্রে স্বয়ং জাগতেন এবং পরিবারের লোকজনকেও জাগাতেন। (বুখারী)

ই'তিকাফ

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلاَتُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَقْرَبُوْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ـ

"তোমরা যখন মসজিদগুলোয় ই'তিকাফের অবস্থায় থাকবে, তখন আপন স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা এর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর নিদর্শনাবলী মানুষের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে থাকেন। সম্ভবতঃ তারা মুত্তাকী হবে।" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ـ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) রমযানের শেষ দশ দিনে ই'তিকাফে বসতেন। (বুখারী)

www.amarboi.org

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ ـ

নবী-পত্নী আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) রমযানের শেষ দশ দিনে ই'তিকাফে বসতেন। এমনকি (এভাবেই) আল্লাহ তাকে উঠিয়ে নিলেন। তারপর তার পত্নীগণও ই'তিকাফ করতেন।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِى الْعَشْرِ الاَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى اِذَا كَانَ لَيْلَةً اِحْدَى وَعِشْرِيْنَ وَهِىَ اللَّيْلَةُ الَّتِىْ يَخْرُجُ مِنْ صَبِيْحَتِهَا مِنْ اِعْتِكَافِهِ قَالَ مَنْ كَانَ اِعْتَكَفَ مَعِىْ فَلْيَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الاَوَاخِرَ وَقَدْ اُرِيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِىْ اَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَطِيْنٍ مِنْ صَبِيْحَتِهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوْهَا فِىْ كُلِّ وِتْرٍ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيْشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرَتْ عَيْنَاىَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبْهَتِهِ اَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ مِنْ صُبْحِ اِحْدَى وَعِشْرِيْنَ ـ

আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) রমযানের মধ্যের দশ দিনে ই'তিকাফে বসতেন। অত:পর এক বছর তিনি (সেই নিয়মে) ই'তিকাফে বসলেন। যখন বেরিয়ে আসছিলেন, তিনি বললেন, যে আমার

www.amarboi.org

সাথে ই'তিকাফ করেছে, সে যেন শেষ দশ দিনে ই'তিকাফ করে। কেননা, এই (কদরের) রাত আমাকে দেখান হয়েছে। অতঃপর তা আমার থেকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি এই রাতে ভোরে পানি ও কাদায় সিজদা দিচ্ছি। অতএব, তোমরা শেষ দশ তারিখে তা তালাশ করো এবং প্রত্যেক বেজোড় রাত্রে তা খোঁজ করো। তারপর সেই রাত্রেই আকাশ থেকে প্রবল বর্ষণ হলো। মসজিদের ছাদে খেজুরের ছাউনি ছিল। এজন্য মসজিদে পানির ফোঁটা পড়তে লাগলো। একুশ তারিখের ভোরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে দেখতে পেলো তার কপালে পানি ও কাদার চিহ্ন। (বুখারী)

ই'তিকাফকারী বিনা দরকারে বাইরে যেন না যায়

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَاِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلاَّ لِحَاجَةٍ اِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ـ

নবী-পত্নী আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার প্রতি তার মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন। অথচ তিনি মসজিদে (ই'তিকাফরত) ছিলেন। আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম। তিনি ই'তিকাফ অবস্থায় জরুরী দরকার ভিন্ন ঘরে যেতেন না। (বুখারী)

ই'তিকাফ অবস্থায় গোসল করা

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُنِيْ وَاَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ ـ

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) আমার হায়েয অবস্থায়ও একই বিছানায় আমার সাথে রাত্রি যাপন করেছেন। তিনি ই'তিকাফের অবস্থায়

www.amarboi.org

মসজিদ হতে তাঁর মাথা বের করে দিলে তা আমি ধুয়ে দিতাম অথচ আমি ঋতুবতী ছিলাম। (বুখারী)

মহিলাদের ই'তিকাফ করা

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ اَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّى الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ اَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَاَذِنَتْ لَهَا فَضُرِبَتْ خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً اٰخَرَ فَلَمَّا اَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الاَخْبِيَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبِرَّ تَرَوْنَ بِهِنَّ فَتَرَكَ الاِعْتِكَافَ ذٰلِكَ الشَّهْرَ ثُمَّ اِعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ -

আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) রমযানের শেষ দশ দিনে ই'তিকাফে বসতেন। আমি তার জন্য (কাপড়ে ঘেরাও করে) তাঁবু বানিয়ে দিতাম। তিনি ফজরের নামায আদায় করে তাতে প্রবেশ করতেন। হাফসা (রা.)-ও আয়েশা (রা.)-এর নিকট অনুরূপ তাঁবু তৈরীর অনুমতি চাইলেন। আয়েশা (রা.) তার জন্য অনুমতি এনে দিলেন। অতএব, হাফসা (রা.)-ও একটি তাঁবু তৈরী করলেন। যায়নাব বিনতে জাহশ যখন তা দেখলেন তিনিও আরেকটি তাঁবু তৈরী করলেন। ভোর বেলায় নবী (সা.) এই তাঁবুগুলো দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এসব কি? তখন তাঁকে (সব) অবগত করান হলো। (তা শুনে) নবী (সা.) বললেন ঃ তারা এসব দ্বারা নেকী হাসিল করতে চায় ? অত:পর তিনি ওই মাসের ই'তিকাফ ভেঙ্গে ফেললেন এবং শাওয়াল মাসে পুনরায় দশ দিনের ই'তিকাফ করলেন। (বুখারী)

www.amarboi.org

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَادَ اَنْ يَّعْتَكِفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ اَرَادَ اَنْ يَّعْتَكِفَ اِذَا اَخْبِيَةٌ خِبَاءُ عَائِشَةَ وَخِبَاءُ حَفْصَةَ وَخِبَاءُ زَيْنَبَ فَقَالَ الْبِرَّ تَقُوْلُوْنَ بِهِنَّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ -

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) একবার ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করলেন। তখন তিনি যে স্থানে ই'তিকাফ করবেন, সে জায়গায় গেলেন। দেখলেন সব তাঁবু পড়েছে। একটি আয়েশার, একটি হাফসার আর একটি তাঁবু যায়নাব (রা.)-এর। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি এগুলোর মধ্যে কল্যাণ নিহিত বলতে চাও ? অতঃপর তিনি ফিরে চলে গেলেন। শেষ পর্যন্ত শাওয়ালের দশ দিন ই'তিকাফ করলেন। (বুখারী)

ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদের দরযায় আসা

عَنْ صَفِيَّةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتْ اَنَّهَا جَاءَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُوْرُهُ فِىْ اِعْتِكَافِهِ فِى الْمَسْجِدِ فِى الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا يَقْلِبُهَا حَتَّى اِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ اُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الاَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِىُّ صَلَّى

www.amarboi.org

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رِسْلِكُمَا اِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالاَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الاِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَاِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ يَّقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا ـ

নবী-পত্নী সাফিয়্যা (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি (একবার) রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর সংগে দেখা করার জন্য মসজিদে গেলেন। নবী (সা.) তখন রমযানের শেষ দশ দিনের ই'তিকাফে ছিলেন। সাফিয়া (রা.) তার নিকট (বসে) সামান্য সময় কথাবার্তা বললেন। এরপর (ঘরে) ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নবী (সা.)-ও সংগে সংগে উঠলেন এবং তাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য উম্মু সালামা (রা.) এর দরযার নিকটস্থ মসজিদের দরযা পর্যন্ত পৌছলেন। সেখানে দু'জন আনসারী সাহাবী পথ চলছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে সালাম করলেন। নবী (সা.) তাদের বললেন, তোমরা (দ্রুত চলে যেওনা) একটু অপেক্ষা করো। এই মেয়েলোকটি হল হুয়াইর কন্যা সাফিয়্যা (আমারই স্ত্রী) তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সম্বন্ধে আমরা কি খারাপ ধারণা করতে পারি? (নবী (সা.)-এর এই) কথাটি তাদের নিকট বিরাট মনে হলো। তখন নবী (সা.) বললেন ঃ নিশ্চয় শয়তান মানুষের শিরায় পৌঁছতে সক্ষম। তাই আমার আশংকা হলো, সে তোমাদের মনে কোন কুধারণার সৃষ্টি করে দেয় নাকি! (বুখারী)

নবী (সা.)-এর বিশ তারিখে ই'তিকাফ বসা

عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَالَ نَعَمْ اِعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

www.amarboi.org

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الاَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ فَخَرَجْنَا صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ قَالَ فَخَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ فَقَالَ اِنِّىْ اُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَاِنِّىْ نَسِيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الاَوَاخِرِ فِى الْوِتْرِ فَاِنِّىْ رَأَيْتُ اَنِّىْ اَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَطِيْنٍ فَمَنْ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعَ النَّاسُ اِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا نَرَى فِى السَّمَاءِ قَزْعَةً قَالَ فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ وَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَسَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الطِّيْنِ وَالْمَاءِ حَتَّى رَأَيْتُ الطِّيْنَ فِىْ اَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ -

আবূ সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে শবে কদর সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করতে শুনেছেন ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে রমযানের মধ্যের দশ দিনে ই'তিকাফে বসেছিলাম। আমরা বিশ তারিখের ভোরে বেরিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বিশ তারিখের ভোরেই আমাদের সামনে ভাষণ দান করলেন। বললেন, আমাকে কদরের রাত্রি দেখান হয়েছে এবং আমাকে তা ভুলিয়েও দেয়া হয়েছে। তাই তোমরা তা শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্রে তালাশ করো। কেননা, আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, আমি পানি ও কাদায় সিজদা করছি। অতএব যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে ই'তিকাফরত আছে তার ফিরে যাওয়া উচিত। সুতরাং লোকজন মসজিদে ফিরে গেলো। আমরা আসমানে এককণ্ড মেঘও দেখলাম না। কিন্তু (হঠাৎ) মেঘ আসলো, বৃষ্টি হলো এবং নামায পড়া হলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) কাদা ও পানিতে

www.amarboi.org

সিজদা করলেন। এমনকি আমি তাঁর কপাল ও নাকে কাদা দেখতে পেয়েছি। (বুখারী)

রমযানে দশ দিন ই'তিকাফ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِىْ كُلِّ رَمَضَانَ عَشَرَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا ـ

আবূ হুরায়য়া (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) প্রতি রমযানে দশদিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তাঁর ইন্তিকাল, হলো সে বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেছেন। (বুখারী)

পূর্ববর্তী নবীগণের যুগে রোযা

১. পূর্ববর্তী উম্মতগণের কারো কারো উপর প্রতি মাসে তিন দিন রোযা ফরয ছিল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

২. হযরত নূহ (আ.) দুই ঈদের দিন ব্যতীত সারা বছর রোযা রাখতেন। (ইবনে মাযাহ)

৩. আশূরার দিন আল্লাহ তাআলা ফিরাউন ও তার দলবলকে নীলনদে ডুবিয়ে হত্যা করেন এবং বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে ফিরাউনের যুলুম-নির্যাতনের হাত থেকে নিষ্কৃতি দান করেন। এজন্য ইহুদীরা এই দিনে রোযা পালন করতেন। (বুখারী)

৪. হযরত ঈসা (আ.) চল্লিশ দিন ধরে রোযা রেখেছিলেন এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যেও চল্লিশ দিন রোযা রাখার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। (মথি, পৃ ঃ ১৬)

৫. হযরত দাঊদ (আ.) আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রাসূল ছিলেন। তাঁর উপর 'যাবুর' কিতাব অবতীর্ণ করেন। তাঁর রোযা ছিল আল্লাহর নিকট পসন্দনীয়। তিনি এক দিন পর এক দিন করে বছরে মোট ছয় মাস রোযা রাখতেন। (বুখারী)

www.amarboi.org

রোযার কতিপয় মাসাইল

রোযা ফরয হওয়ার শর্তাবলী

রোযা ফরয হওয়ার শর্ত চারটি যথা:

১. মুসলমান হওয়া। কাফিরের উপর রোযা ফরয নয়।

২. বালিগ হওয়া। নাবালিগের উপর রোযা ফরয নয়। তবে অভ্যাস সৃষ্টি করার জন্য নাবালগ ছেলেমেয়েদের রোযা রাখতে বলা উচিত। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

৩. রমযানের রোযা ফরয হওয়া সম্বন্ধে জানা থাকা

৪. মাযুর বা অক্ষম না হওয়া। অর্থাৎ এমন কোন ওযর না থাকা যাতে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। যেমন- সফর, বার্ধক্য, রোগ, জিহাদ ইত্যাদি। (আসান ফিকাহ)

রোযার নিয়ত

১. রোযার নিয়ত করা ফরয। নিয়ত ছাড়া রোযা পালন করা অর্থহীন। যেমন, কোন ব্যক্তি সারাদিন পানাহার বা স্ত্রী সহবাস না করে রোযাদারের ন্যায় থাকলো অথচ সে রোযার নিয়ত করেনি। তবে তার রোযা হবে না।

২. মনে মনে রোযা রাখার ইচ্ছা করাই হচ্ছে নিয়ত। এর জন্য শাব্দিক উচ্চারণ আদৌ জরুরী নয় । নিয়ত সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট বাক্য রাসূল (সা.) হতে প্রমাণিত নাই। (শামী)

৩. রমযানের সেহরী খাওয়ার সময়ই নিয়ত করতে হবে। তবে নফল রোযার জন্য সুবহে সাদিক থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় নিয়ত করলে তা শুদ্ধ হবে।

৪. যদি কোন রোযাদার ব্যক্তি মনে মনে ধারণা করে যে সে রোযা ভেঙ্গে ফেলবে, কিন্তু কার্যত সে পানাহার বা রোযা ভঙ্গের কোন কাজই করেনি এতে তার পূর্ব নিয়ত নষ্ট হবে না, বরং রোযা আদায় হয়ে যাবে। (আলমগীরী)

www.amarboi.org

৫. কেউ যদি রমযানের রোযার কাযা ও মান্নতের রোযার নিয়ত একত্রে করে থাকে তবে রমযানের কাযাই আদায় হবে। মান্নতের রোযা আদায় হবে না। (আলমগীরী)

৬. রমযানের কাযা ও নফল রোযা একত্রে নিয়ত করলে রমযানের কাযা আদায় হবে নফল রোযা আদায় হবে না।

৭. কোন মহিলার মাসিক ঋতু চলাকালীন অবস্থায় রাতে রোযা রাখার নিয়ত করে সুবহে সাদিক হয়ার পূর্বে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তবে তার নিয়ত শুদ্ধ হবে এবং রোযা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সুবহে সাদিকের পরে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়, তবে তার রোযা আদায় হবে না।

রোযার ফরয

রোযার ফরয তিনটি । যথাঃ

১. রোযার নিয়ত করা।

২. কোন কিছু পানাহার করা থেকে বিরত থাকা।

৩. সকল ধরনের যৌন বাসনা পূর্ণ করা থেকে বিরত থাকা।

রোযার সুন্নাত

১. সেহরী খাওয়া।

২. সেহরী সুবহে সাদিকের সামান্য পূর্বে খাওয়া।

৩. সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করা।

৪. রমযান মাসের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করা।

৫. সর্বদা নেককাজে রত থাকা।

৬. গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যা বলা, হৈ-হাঙ্গামা, রাগ এবং বাড়াবাড়ি না করা।

রোযা ভঙ্গের কারণ

যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় তা দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

(ক) যে সব কারণে রোযার কাযা করা ওয়াজিব হয়।

(খ) যে সব কারণে রোযার কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হয়।

www.amarboi.org

যে সব কারণে রোযার কাযা করা ওয়াজিব হয়

১. সেহরীর সময় আছে মনে করে সুবহে সাদিকের পর পানাহার করলে বা স্ত্রী সহবাস করলে।

২. স্ত্রীকে চুম্বন স্পর্শ করার কারণে বীর্যপাত হলে।

৩. জোরপর্বক রোযাদারকে কিছু খাওয়ালে।

৪. ভুলক্রমে কোন কিছু খেতে আরম্ভ করলে রোযা নষ্ট হয়েছে মনে করে পুনরায় আহার করলে।

৫. কুলি করার সময় অসাবধানতায় গলার মধ্যে পানি চলে গেলে অথবা ডুব দেয়ার সময় হঠাৎ নাক, মুখ দিয়ে গলার মধ্যে পানি চলে গেলে।

৬. পেশাব পায়খানার রাস্তায় ঔষধ বা অন্য কিছু প্রবেশ করালে।

৭. ঘুমন্ত অবস্থায় কিছু খেয়ে ফেললে।

৮. সূর্য অস্ত গেছে মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করলে।

৯. দাঁত হতে ছোলা পরিমাণ কোন কিছু বের করে খেলে।

১০. ইচ্ছা করে মুখ ভরে বমি করলে।

১১. মুখে বমি আসার পর পুনরায় তা গিলে ফেললে।

১২. নাকে বা কানে তরল ঔষধ ব্যবহার করলে যা ভিতরে অনায়াসে যেতে পারে।

১৩. বৃষ্টির পানি মুখে পড়লে তা গিলে ফেললে।

১৪. কোন নফল রোযা স্বেচ্ছায় ভেঙ্গে ফেললে।

১৫. রোযার সেহরী খাওয়ার পর কেউ যদি পান মুখে রেখে ঘুমিয়ে পড়ে এবং তা মুখে থাকা অবস্থায় ভোর হয়ে যায়, তাহলে সে রোযা শুদ্ধ হবে না; কিন্তু রোযা ভাঙ্গতেও পারবে না। পরে এর কাযা আদায় করতে হবে।

www.amarboi.org

যে সব কারণে রোযার কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হয়

১. রোযা অবস্থায় ইচ্ছাপূর্বক পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস করলে।

২. স্বেচ্ছায় হস্তমৈথুন বা অন্য যে কোন উপায়ে বীর্যপাত ঘটালে।

৩. স্বামী-স্ত্রী বা অন্য কোন পুরুষ ও নারী যদি যৌন মিলনের আকাঙ্ক্ষায় একত্রিত হয় এবং পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর বিশেষ অঙ্গে প্রবেশ করায়, তবে রোযার কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে।

৪. কেউ এমন কোন কাজ করলো যাতে রোযা নষ্ট হয় না। কিন্তু রোযা নষ্ট হয়েছে মনে করে রোযা ভেঙ্গে ফেললো, তখন তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। যেমন, চোখে সুরমা লাগালো, মাথায় তেল দিলো, অথবা স্ত্রীকে চুমো দিলো বা মেয়ে মানুষকে জড়িয়ে ধরলো আর মনে করলো রোযা নষ্ট হয়েছে। তারপর রোযা ভেঙ্গে ফেললো।

৫. রমযান মাসে শরয়ী কোন ওযর না থাকার পরও স্বেচ্ছায় রোযা না রাখলে কাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

কাযা-কাফ্ফারার বিবরণ

'কাযা' অর্থ ক্ষতিপূরণ করা । রোযা কাযা করার অর্থ হচ্ছে শরীঅতসম্মত কোন কারণে যে পরিমাণ রোযা রাখতে অক্ষম হয়, সে পরিমাণ রোযা রমযানের পরে আদায় করা।

'কাফ্ফারা' শব্দের অর্থ গোপন করা, প্রতিবিধান করা। ঢেকে রাখা, আবৃত করা। শরীঅতের পরিভাষায় কোন গুনাহর কাজকে ঢেকে রাখতে বা প্রতিরোধ করতে যে কাজ করা হয় বা যা কিছু দান করা হয়, তাকে কাফ্ফারা বলে।

১. রমযানের দিনে স্ত্রী-সহবাসজনিত রোযার কাফ্ফারা হলো ৬০টি রোযা। এ রোযা লাগাতারভাবে পালন করতে হয়। এমনকি যদি কেউ ৫৯টি রোযা রাখার পর তা ছেড়ে দেয় তাহলেও তাকে পুনরায় শুরু থেকে ৬০টি রোযা রাখতে হবে।

www.amarboi.org

২. যদি কারো রোযা রাখার শক্তি না থাকে, তাহলে রমযান মাসের কাযার রোযার জন্য ৬০জন মিসকীনকে দুবেলা তৃপ্তি সহকারে খাওয়াতে হবে।

৩. রমযান মাসের একের অধিক রোযা ভেঙ্গে থাকলে একটি কাফ্ফারাই ওয়াজিব হবে। কিন্তু যে কয়টি রোযা ভেঙ্গেছে সে কয়টি রোযা কাযা করতে হবে।

যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না

১. কোন রোযাদার ব্যক্তি যদি ভুলে কোন কিছু পান করে ও রোযার কথা একেবারে মনেই না থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তির রোযা ভঙ্গ হবে না। (হিদায়া)

২. অনিচ্ছায় বমি হলে।

৩. নাকে অথবা কানে পানি গেলে।

৪. অধিক পরিমাণে মুখের থুথু গিলে ফেললে।

৫. ঢেকুর উঠলে।

৬. তৈল মালিশ করলে।

৭. আতর বা কোন সুঘ্রাণ নিলে।

৮. চোখে সুরমা ব্যবহার করলে।

৯. স্বপ্নদোষ হলে।

১০. রাতের ফরয গোসল দিনে করলে।

১১ . রোগের কারণে বা বিনা উত্তেজনায় অথবা অনিচ্ছায় বীর্যপাত হলে।

১২. হঠাৎ করে মশা-মাছি বা ধুলোবালি গলার ভিতরে চলে গেলে।

১৩. মিথ্যা কথা ও ফাহেশা কথা বললে।

১৪. গীবত করলে।

www.amarboi.org

যে কারণে রোযা মাকরূহ হয়

১. গীবত করা, মিথ্যা বলা, গালিগালাজ করা, মারপিট করা অথবা অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করা।

২. কোন কিছুর আস্বাদন গ্রহণ করা। বদমেজাজী স্বামী বা মনিবের ভয় থাকলে তরকারি বা খাদ্যদ্রব্য জিহবা দিয়ে স্বাদ নেয়া মাকরূহ নয়।

৩. মুখে খাদ্যদ্রব্য চিবানো। অবশ্য বাচ্চাদের খাওয়ানোর বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় প্রয়োজনে মুখে খাদ্যদ্রব্য চিবিয়ে বাচ্চাদের খাওয়াতে পারবে।

৪. ইচ্ছা করে সামান্য পরিমাণ বমি করা।

৫. উযুর সময় বারবার কুলি করা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা।

৬. ভেজা কাপড়-চোপড় শরীরে জড়িয়ে রাখা।

৭. ইফতারের সময় বিলম্ব করা।

৮. মুখের মধ্যে তৈল ঢালা।

৯. রোযা রেখে এমন কোন কাজ করা যাতে রোযাদারের দুর্বল হয়ে ভেঙ্গে ফেলার আশংকা হয়।

১২. স্ত্রীর ঠোঁট মুখে নেয়া, উলঙ্গ অবস্থায় জড়িয়ে ধরা মাকরূহ।

১৩. বিনা কারণে থুথু জমা করে গিলে ফেলা।

যে অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করা জায়েয

১. মুসাফির ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখা জায়েয।

২. অসুস্থ ব্যক্তি : যার রোযা রাখলে রোগ বৃদ্ধির আশংকা আছে। সে রোযা থাকলেও এমতাবস্থায় রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে।

৩. বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি, বয়স বেশী হওয়ার কারণে রোযা রাখলে সে দুর্বল অথবা নিজের জীবন নাশের আশংকা থাকলে রোযা না রাখা জায়েয।

৪. গর্ভধারণকারিণী, রোযা রাখলে সন্তানের ক্ষতির আশংকা থাকলে অথবা নিজের জীবন নাশের আশংকা থাকলে রোযা না রাখা জায়েয।

www.amarboi.org

৫. স্তন্যদানকারিণী, স্তন্যদানকারিণী মহিলার দুধ কমে যাওয়ার আশংকা থাকলে এবং তাতে স্তন্যপায়ী শিশুর কষ্ট হওয়ার আশংকা থাকলে।

৬. সাপে কাটা ব্যক্তি, যাকে সাপে দংশন করেছে, সে রোযা ছেড়ে দিতে পারবে।

৭. সংজ্ঞাহীন ব্যক্তি : কোন ব্যক্তি রোযা রেখে এমন দুর্ঘটনায় পতিত হলে অথবা হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে, যাতে রোযা ছেড়ে না দিলে প্রাণনাশের আশংকা রয়েছে সে ক্ষেত্রে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয।

অন্যান্য মাসাইল

মেসওয়াক ও পেস্ট ব্যবহার

১. রোযাদার ব্যক্তির রোযা রেখে মেসওয়াক করা জায়েয। চাই তা শুষ্ক ডালের অথবা সবুজ সতেজ ডালের দ্বারা হোক। দিনের প্রথমাংশে হোক বা দিনের শেষাংশে হোক। (আলমগীরী)

২. রোযা রেখে দিনের বেলা পেস্ট, টুথ পাউডার, কয়লা বা মাজন দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করা মাকরূহ।

ঔষধ সেবন

কানে তেল ঢাললে বা নাকে নস্য টানলে অথবা পায়খানার জন্য ড্রস লাগালো রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। এ জন্য রোযা কাযা করতে হবে। কিন্তু কাফফারা দিতে হবে না।

অস্ত্রোপচার ও ইঞ্জেকশন

১. ইঞ্জেকশন দ্বারা শরীরে রক্ত বা ঔষধ যাই পৌঁছানো হোক না কে,ন তা যদি উদরাগত বা মস্তিষ্কগত না হয় তাহলে এতে রোযা ভঙ্গ হবে না। (আধুনিক যন্ত্রপাতির শরয়ী বিধান)

২. হাত পা ইত্যাদি অঙ্গের অস্ত্রোপচারে রোযা নষ্ট হবে না। কারণ, এতে রোযার উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। এমন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যার সাথে মস্তিষ্ক ও পেটের সংযোগ আছে তাতে অস্ত্রোপচারে রোযার কোন ক্ষতি নেই। তবে অস্ত্রোপচারের সময় যদি এমন ঔষধ ঢেলে দেয়া হয়

www.amarboi.org

যা পেটে এবং মস্তিষ্কে পৌঁছে, তাতে রোযা নষ্ট হবে। (জাদীদ ফেকহী মাসাইল)

রোযার কতিপয় আদব

১. যে ব্যক্তি শরীঅতসম্মত কারণে রোযা পালনে অক্ষম, সে যেন সারা দিন প্রকাশ্যে পানাহার না করে বাহ্যিকভাবে রোযাদারের মত সময় অতিবাহিত করে।

২. কোন মুসাফির ব্যক্তি বাড়ী ফিরে এসে মুকীম হওয়ার নিয়ত করলে তার দিনের বাকী অংশ রোযা পালনকারীর মত অতিবাহিত করা মুস্তাহাব।

৩. যার মধ্যে রোযা পালনের সকল শর্ত পাওয়া যাবে, তার রোযা কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেলে ঐ দিনের বাকী সময় তার রোযাদার ব্যক্তির মত অতিবাহিত করা ওয়াজিব।

৪. কোন ব্যক্তি রাত আছে মনে করে যদি সুবহে সাদিকের পরে খানা খায় অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে দিনের বেলা রোযা নষ্ট করে ফেলে, তবু তার রোযাদারের মত দিনের বাকী অংশ অতিবাহিত করা ওয়াজিব।

৫. রোযা রাখার নিয়ত করার পর যদি কোন মহিলার হায়েয শুরু হয়ে যায়, তখন যদি সে রোযা ছেড়ে দিবে বলে রোযা নষ্ট করে ফেলে, তবু সে রোযাদারের মত দিনের বাকী অংশ রোযাদারের ন্যায় অতিবাহিত করবে।

তারাবীহর নামাযের বিবরণ

১. রমযান মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে ইশার ফরয নামাযের পর বিতরের পূর্বে যে নামায আদায় করা হয়, তাকে তারাবীহর নামায বলে। শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলে সে নামায বন্ধ করতে হয়।

২. ইশার ফরয নামাযের পূর্বে তারবীহর নামায পড়া জায়েয নেই। এভাবে কেউ পড়লে তাকে ইশার নামায পড়ে পুনরায় তারাবীহ পড়তে হবে।

৩. তারাবীহর নামাযের প্রতি চার রাকআতের পর সমপরিমাণ সময় বসে বিশ্রাম করা উত্তম। তবে যদি অধিক সময় বসে থাকার কারণে

www.amarboi.org

লোকদের অসুবিধা হয় অথবা জামাআতের লোকসংখ্য কমে যাওয়ার আশংকা থাকে, তবে কম সময় বিশ্রাম করবে। (আলমগীরী)

৪. বিশ্রামের সময় দুআ করা, তাসবীহ পড়া, যিকর করা, দুরূদ শরীফ পড়া সবই জায়েয। এ অবস্থায় পড়ার জন্য নির্দিষ্ট কোন দুআ নেই।

৫. তারাবীহর পরেই বিতর নামায পড়তে হয়, কিন্তু কোন কারণবশত: যদি কিছু তারাবীহর অথবা সম্পূর্ণ তারাবীহর পূর্বে বিতর নামায পড়ে, তবে তাও জায়েয হবে।

৬. তারাবীহর নামাযে পুরো রমযানে একবার কুরআন খতম করা সুন্নাত। রাসূল (সা.) রমযান মাসে সমস্ত কুরআন হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে শুনাতেন।

৭. ইচ্ছা করে ইশার নামায জামাআতে না পড়ে তারবীহর নামায জামাআতের পড়া জায়েয হবে না। এতে ইশার নামাযের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। কারণ, ইশার নামায ফরয আর তারাবীহর নামায সুন্নাতে মুআক্কাদা।

৮. কেউ যদি মসজিদে এসে দেখে ইশার জামাআত শেষ করে তারাবীহর নামায শুরু করেছে, এ অবস্থায় সে ইশার জামাআত পেলো না। তখন সে একাকী এশা নামায পড়ে তারাবীর জামায়াত শামিল হবে। ছুটে যাওয়া তারবীহর নামায পরে পড়বে। (শামী)

৯. ইমামের সাথে যদি সব তারাবীহর নামায না পেয়ে থাকে এবং ছুটে যাওয়া তারাবীহ পড়লে বিতরের জামাআত তরক হতে পারে, তাহলে আগে ইমামের সাথে বিতর নামায পড়ে বাকী তারাবীহ পরে পড়বে। (আলমগীরী)

১০. কোন ব্যক্তির ছুটে যাওয়া তারাবীহ কাযা করতে হবে না।

কদরের রাতের গুরুত্ব

'লাইলাতুল কদর' অর্থ মহিমান্বিত রাত। 'কদর' শব্দের দুটো অর্থ। যথা: একটি হচ্ছে ভাগ্য বা তাকদীর। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে মর্যাদা বা সম্মান।

www.amarboi.org

লাইলাতুল কদরে মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তী বছরের রিযিক বন্টন, জীবন-মৃত্যু ও তাদের যাবতীয় কাজের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ কারণে এ রাতকে ভাগ্য রজনীও বলা হয়। যে ব্যক্তি এ রাতে ইবাদতে রত থাকে এবং তাওবা-ইস্তিগফার করে, আল্লাহর সমীপে তার সম্মান ও মর্যাদা বহুগুণে বেড়ে যায়।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে :

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ - فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ -

অর্থাৎ আমরা এই কুরআনকে এক বরকতময় রাত্রে নাযিল করেছি। আমরা লোকদেরকে সতর্ককারী। এই রাতে সকল প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফায়সালা করা হয়। (সূরা আদ-দুখান ঃ ৩-৪)

কদরের রাতের মর্যাদা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ -

"কদরের রাতটি হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।" (সূরা আল-কদর)

লাইলাতুল কদরে করণীয় :

১. আল্লাহ নির্ধারিত ফরয ও ওয়াজিবসমূহ যথা নিয়মে আদায় করতে হবে।

২. কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআন অধ্যয়ন করা।

৩. অধিক পরিমাণে নফল ইবাদত করা।

৪. যিকির করা, দুরূদ পড়া, তাসবীহ পাঠ করা।

৫. বিনয়ের সাথে চোখের পানি ফেলে তাওবা-ইস্তিগফার করা।

৬. সাধ্যমত দান সাদাকাহ করা।

৭. মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজনসহ সকল মুসলিমের জন্য দু'আ করা।

৮. পূর্ণ ইখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত করা।

www.amarboi.org

৯. দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে ধরনা দেয়া।

১০. পরিবার-পরিজনকে ইবাদতের জন্য রাত্রে জাগানো।

রাসূল (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে কদরের রাতে এ দু'আ পড়তে বলেছেন:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ -

"আয় আল্লাহ! আপনি বড় ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী, আপনি ক্ষমা করাকে পসন্দ করেন, অতএব আমার গুনাহ মাফ করে দিন।

ই'তিকাফ

ই'তিকাফ আরবী 'উকুফ' শব্দ থেকে লওয়া হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসকে আঁকড়ে ধরা, কোন স্থানে অবস্থান করা। পরিভাষায়: মহান প্রভু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভোর আশায় মসজিদে অবস্থান করা।

ই'তিকাফের উদ্দেশ্য

ই'তিকাফের উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টির সাথে সম্পর্কে ছিন্ন করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। এতে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক গভীর হয় ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়। (লাতায়েফুল মা'আরিফ)

ই'তিকাফের ফযীলত

রাসূল (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রমযানের দশ দিন এতেকাফ করে, দুই হজ্জ ও দুই উমরার সমান সওয়াব হবে। (বায়হাকী)

রাসূল (সা.) বলেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিন ই'তিকাফ করবে, আল্লাহ তাআলা তার ও জাহান্নামের মধ্যে তিন খন্দক (পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত) পরিমাণ দূরত্ব সৃষ্টি করেন।" (তাবারানী) ও হাকিম)

রাসূল (সা.)-এর ই'তিকাফ : আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত : নবী করীম

www.amarboi.org

(সা.) প্রতি রমযান মাসের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। (বুখারী, মুসলিম)

আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত : মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ নবী (সা.)-কে মৃত্যু দান করার আগ পর্যন্ত তিনি নিয়মিতভাবে রমযানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। (বুখারী, মুসলিম)

ই'তিকাফের প্রকারভেদ :

ই'তিকাফ তিন প্রকার। যথা:

১. ওয়াজিব : ই'তিকাফ করার মান্নত করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব।

২. সুন্নাত : রমযানের শেষ ১০দিন ই'তিকাফ করা সুন্নাত।

৩. মুস্তাহাব : ওয়াজিব ও সুন্নাত ই'তিকাফ ব্যতীত অন্য সকল ই'তিকাফ হচ্ছে মুস্তাহাব।

ই'তিকাফের শর্ত

১. মুসলমান হওয়া : অমুসলিমের উপর ই'তিকাফ করা কর্তব্য নয়।

২. সুস্থমস্তিষ্ক হওয়া।

৩. বালিগ হওয়া : নাবালিগ শিশুর উপর এতেকাফ করা কর্তব্য নয়।

৪. নিয়ত করাঃ ই'তিকাফের নিয়ত করা ব্যতীত ই'তিকাফ সহীহ হবে না।

৫. মসজিদে ই'তিকাফ করা: পুরুষদের জন্য মসজিদে অবস্থান করা।

ই'তিকাফের নিয়মাবলী

১. মসিজদের ভিতরে পর্দা দিয়ে থাকার ব্যবস্থা করবে।

২. ই'তিকাফের স্থানে খাবে ও শুবে।

৩.পেশাব-পায়খানা ও ফরয গোসলের জন্য বেরুতে পারবে।

৪. মহিলা নিজ গৃহে ই'তিকাফ করবে।

www.amarboi.org

ই'তিকাফের মুস্তাহাব কাজ :

১. কুরআন তিলাওয়াত করা ও অধ্যয়ন করা।

২. যিকর আযকার করা।

৩. দ্বীন সম্পর্কিত গবেষণা ও রচনার কাজ করা।

৪. দ্বীনের মাসাইল শিক্ষা করা।

৫. তাসবীহ তাহলীলে রত থাকা।

৬. তাওবা-ইস্তিগফার করা।

মহিলাদের ই'তিকাফ ও হায়েয ও নিফাসের অবস্থায় এর বিধান

মহিলারা নিজ ঘরে ই'তিকাফ করবেন, যেখানে তারা নামায পড়ে থাকেন। তাদের জন্য মসজিদের ই'তিকাফ করা জায়েয নেই।

ই'তিকাফ অবস্থায় কোন মেয়েলোকের হায়েয অথবা নিফাস শুরু হলে তখন ই'তিকাফ ছেড়ে দিবে। কারণ, হায়েয-নিফাস অবস্থায় ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যায়।

মহিলাদের রোযার মাসায়েল

১. হায়েয-নিফাস চলাকালীন অবস্থায় মেয়েলোকের রোযা রাখা হারাম। পবিত্র হওয়ার পর ছুটে যাওয়া রোযাসমূহের কাযা আদায় করা ফরয।

২. রমযান মাসের দিনের বেলা কোন মহিলা যদি পবিত্রতা লাভ করে তার জন্য দিনের বাকী সময়টুকু পানাহার থেকে বিরত থাকা জরুরী। মনে করুন, রমযান মাসে কোন একদিন দুপুরের সময় কোন মহিলা হায়েয-নিফাস থেকে পবিত্রতা লাভ করলো। তখন থেকে ইফতার পর্যন্ত রমযানের সম্মানার্থে না খেয়ে থাকা তার উচিত। যদিও সে দিনের বাকী সময় রোযাদার ব্যক্তির মত কাটালো তবু ঐ দিনের রোযা তাকে কাযা করতে হবে।

৩. যদি কোন মেয়েলোকের রোযা অবস্থায় হায়েয অথবা নিফাস আরম্ভ হয়

www.amarboi.org

তখনই সে রোযা ছেড়ে দিবে। চাই সে রোযা ফরয হোক অথবা নফল হোক। পবিত্রতা লাভের পর সে রোযার কাযা আদায় করবে। যদিও দিনের শেষ মুহূর্তে ইফতার করার দু'চার মিনিট পূর্বে হোক না কেন।

৪. কোন মেয়েলোকের যদি অভ্যাস অনুয়ায়ী নির্দিষ্ট সময় হায়েয বা নিফাস বন্ধ হয়, আর তখন যদি রাতের সামান্য সময় বাকী থাকে, তাহলে পরের দিনের রোযা রাখা তার উপর ওয়াজিব।

৫. কোন মেয়েলোকের যদি নিয়মিত তিন দিন করে ঋতুস্রাব আসার অভ্যাস থাকে এবং কোন এক মাসে এ নিয়ম পবিবর্তন হয়ে এ ঋতুস্রাব সাত দিনে গিয়ে শেষ হয়, তাহলে তাকে সাত দিন হায়েয বলে গণ্য করতে হবে এবং তার মনে করতে হবে পূর্বের নির্ধারিত নিয়ম পরিবর্তন হয়েছে। এ অতিরিক্ত রক্ত স্রাব আসার কারণে তাকে অপেক্ষা করতে হবে। এ সময় কোন রোযা রাখতে পারবে না। পাক হওয়ার পরে তাকে ছুটে যাওয়া রোযাগুলো কাযা করতে হবে।

যদি তিন দিনের পরে দশ দিনের বেশী সময় স্রাব প্রবাহিত হয়, তাহলে তিন দিনের পরের সকল দিনকেই ইস্তেহাযা বলে গণ্য করতে হবে এবং তিন দিনের পরের ছুটে যাওয়া রোযাসমূহের কাযা আদায় করতে হবে।

সাদকায়ে ফিতর

সাদকায়ে ফিতরকে সাধারণত ফিতরা বলা হয়। ফিতরা অর্থ রোযা খোলা বা ভঙ্গ করা। হাদীসে একে যাকাতুল ফিতর বলে উল্লেখ আছে। যাকাতুল ফিতর ব্যক্তির দিকে আর যাকাত সম্পদের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। যাকাত যেমন সম্পদকে পবিত্র করে, সেভাবে যাকাতুল ফিতর ব্যক্তিকে পবিত্র করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত : রাসূল (সা.) যাকাতুল ফিতরকে রোযাদারের বেহুদা কথা ও কাজ এবং গুনাহ থেকে পবিত্র করা এবং নি:স্ব অসহায় মিসকীনদের খাবার উদ্দেশ্যে ফরয করেছেন।

www.amarboi.org

যে ব্যক্তি তা ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করে, সেটি আল্লাহর কাছে কবুল হয়। আর যে ব্যক্তি তা ঈদের নামাযের পর আদায় করে তা অন্যান্য দান-সাদকার মত বিবেচিত হবে। (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকিম)

সাদকায়ে ফিতর কার উপর ওয়াজিব

ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় জীবিকা নির্বাহের আবশ্যকীয় সামগ্রী ছাড়া নিসাব পরিমাণ টাকা বা সম্পদের অধিকারী হলেই প্রত্যেক সচ্ছল নারী-পুরুষ নাবালক সাবালক সকলের উপর সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব।

আরেকটি পার্থক্য হলো, যাকাতের জন্য সোনা, রূপা, ব্যবসার মাল হওয়া জরুরী। নগদ অর্থ, ধান-চালও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ফিতরার জন্য এ কয়টি জিনিসই শর্ত নয়, বরং যাবতীয় মাল অর্থাৎ জায়গা-জমিও এর অন্তর্ভুক্ত।

কারো ঋণ আছে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল আছে তার বিধান

কারো যদি মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল থাকে এবং তৎসঙ্গে ঋণও থাকে, তাহলে আন্দাজ করে দেখতে হবে ঋণ পরিশোধের পর কি পরিমাণ অতিরিক্ত থাকে। তা যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে ফিতরা ওয়াজিব হবে। আর নিসাব পরিমাণের চাইতে কম উদ্বৃত্ত থাকলে ফিতরা ওয়াজিব হবে না।

কি কি জিনিস দিয়ে ফিতরা দেয়া যায় এবং এর পরিমাণ

ফিতরা চার প্রকার জিনিস দ্বারা দেওয়া যায় যব, গম, খুরমা, কিশমিশ। এগুলো ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে দিলে যেমন টাকা, চাল, আটা, ধান ইত্যাদি তখন এ চারটি জিনিসের মূল্য ধার্য করে দিতে হবে। গম দেয়ার চাইতে আটা দেয়া এবং আটার চাইতে নগদ অর্থ দেয়া ভাল। (আলমগীরী)

গম ফিতরা হিসেবে দিলে আশি তোলা সেরের হিসেবে এক সের সাড়ে বারো ছটাক গম দিতে হবে। আর টাকা দিলে ঐ পরিমাণ গমের স্থানীয় বাজার দর হিসাবে করে দিতে হবে। যব, খুরমা, কিশমিশ দিতে হলে গমের সমান দিবে। (আসান ফিকাহ, আলমগীরী)

www.amarboi.org

হযরত আবূ সাঈদ খুদুরী (রা.) বলেন, আমরা এক সা' পরিমাণ খাদ্য বস্তু ফিতরা দিতাম। তখন আমাদের খাবার ছিল যব, কিশমিশ, পনীর ও খুরমা। (বুখারী শরীফ)

গমের পরিবর্তে টাকা দিলে কোন এলাকার বাজারাদর সাব্যস্ত হবে ?

গম, যব, খুরমা কিংবা কিশমিশের পরিবর্তে টাকা দিতে হলে নিজ এলাকার বা আশপাশের বাজার মূল্য হিসাব করতে হবে। এখানে যদি গম পাওয়া না যায় তাহলে আটার হিসাব করা উচিত। (ফাতওয়া দারুল উলূম)

সাদকায়ে ফিতরের বিবরণ ও মাসাইল

১. সচ্ছল ব্যক্তি নিজের ও নাবালগ সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে সাদকায়ে ফিতর আদায় করবে। এমনকি যে সন্তান ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পূর্বে জন্ম নিলো, তার পক্ষ থেকেও ফিতরা দেয়া ওয়াজিব। অবশ্য ঈদের দিন সুবহে সাদিকের আগে যে শিশু মারা গেলো তার পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব নয়।

২. যে সন্তান হুঁশজ্ঞান হারিয়ে ফেলে তার মাল সম্পদ থাক বা না থাক তার পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব। চাই যে সাবালগ হোক বা না হোক।

৩. যারা খাদিম বা চাকর-বাকরের পৃষ্ঠপোষক ও ভরণপোষণ করে তারা তাদের পক্ষে থেকে ফিতরা আদায় করবে।

৪. সাবালগ সন্তান তার নিজের ফিতরা নিজেই আদায় করবে, পিতার উপর তা আদায় করা ওয়াজিব নয়। হ্যাঁ, সন্তান যদি দরিদ্র হয় তাহলে দেয়া ওয়াজিব।

৫. স্ত্রী ও প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব নয়। অবশ্য তাদের পক্ষ থেকে তা দিয়ে দিলে ফিতরা আদায় হয়ে যাবে। স্ত্রী যদি সচ্ছল হয়, তাহলে শুধু তার পক্ষ থেকে সাদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে। স্বামী, সন্তান ও অন্যান্য আত্মীয়দের পক্ষ

www.amarboi.org

থেকে তার উপর আদায় করা ওয়াজিব নয়।

৬. ঈদের দিন কেউ যদি ফিতরা আদায় করতে না পারে, তবে তা পরে আদায় করতে হবে।

৭. ইয়াতীম সন্তান নিসাবের মালিক হলে তাকেও ফিতরা আদায় করতে হবে।

৮. বিবাহিতা কন্যা সম্পদশালী হলে নিজেই ফিতরা আদায় করবে।

৯. বিবাহিতা কন্যা যদি অপ্রাপ্ত বয়স্কা হয় অথবা নিসাবের মালিক না হয়, সে ক্ষেত্রে স্বামীর ঘরে না যাওয়া পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে পিতাকে ফিতরা আদায় করতে হবে।

১০. বিবাহিতা মেয়ে স্বামীর ঘরে গেলে যত দিন পর্যন্ত সে সম্পদশালী না হবে, ততদিন পর্যন্ত তার ফিতরা স্বামীকে বহন করতে হবে।

১১. কেউ ঋণগ্রস্ত হলে ঋণের টাকা বাদ দেয়ার পর যদি সে নিবাবের মালিক হয় তবে তাকে ফিতরা দিতে হবে। মালিকানা হলে দিতে হবে না।

১২. একজনের ফিতরা একজন মিসকীন অথবা কয়েকজন মিসকীনকে দিতে পারবে তবে একজনকে এ পরিমাণ দেয়া উচিত যাতে করে সে ছোটখাটো প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হয়।

১৩. যাদের উপর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব নয়, তারা তা গ্রহণ করতে পারে। যাদেরকে যাকাত দেয়া যায়, তাদেরকে ফিতরা দিতে কোন বাধা নেই।

১৪. ফিতরা পাওয়ার তারাই বেশী হকদার, যারা নিজ আত্মীয়, মুসলিম ও অমুসলিম প্রতিবেশী।

১৫. ফিতরাসহ যে কোন দান গোপন রাখাই শ্রেয়, আত্মীয়-স্বজনকে একথা বলার প্রয়োজন নেই যে, এটি ফিতরার বা যাকাতের টাকা। নিয়ত থাকাই যথেষ্ট।

www.amarboi.org

মাহে রমযানে আমাদের করণীয়

আল্লাহ তাআলা যে উদ্দেশ্যে মাহে রমযানের রোযা আমাদের উপর ফরয করেছেন তা অর্জন করতে পারলে আমাদের জীবন হয়ে উঠবে সুন্দর, পূত-পবিত্র ও কল্যাণময়। রমযানের যথার্থ কল্যাণ লাভের জন্য আমাদের যে কাজগুলো গুরুত্ব সহকারে করতে হবে তা হচ্ছে :

১. কুরআনের অধ্যয়নে গভীর মনোনিবেশ করতে হবে।

২. ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কুরআনের দাওয়াত যথাযথভাবে মানুষের নিকট পৌঁছাতে হবে।

৩. ব্যক্তিগতভাবে ও সামাজিক পর্যায়ে সিয়ামের যথার্থ অনুশীলন করতে হবে।

৪. রমযানের পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে।

৫. রমযানের পবিত্রতা বিরোধী সকল অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে।

৬. সমাজের অভাবী মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে।

৭. দারিদ্র বিমোচনে সাধ্যমত ভূমিকা পালন করতে হবে।

৮. ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে হবে।

৯. সমাজ ও রাষ্ট্রে দ্বীনী ও তাকওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

১০. রমযান মাসে অপচয় বন্ধ করতে হবে।

১১. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ভেজাল প্রদান ধোকা, প্রতারণা, মুনাফাখোরী ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে।

১২. রাতের ইবাদতের প্রতি যথার্থভাবে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

১৩. দান সদকার মাত্রা যথাসাধ্য বাড়িয়ে দিতে হবে।

www.amarboi.org

রোযা সম্পর্কে অমুসলিম মনীষীদের অভিমত

বিজ্ঞানী মেঘনাথ সাহ :

রোযা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অত্যন্ত মঙ্গলকর। কারণ, রোযা পালনে পেটের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ থাকতেই পারে না বলে আমি মনে করি। মুসলমানদের পুণ্যাহ উপবাসব্রত বিজ্ঞানীর বহু শাখা-প্রশাখায় গন্ধ পাওয়া যায়। এগারো মাস পর একাধারে এ নিয়ম অত্যন্ত সুন্দর।

ডা: হেনরি এডওয়ার্ড :

রোযা মাসের রোযা মানে অসামাজিক কার্যকলাপ, কতিপয় ব্যক্তিগত সমস্যা ও রোগশোক এবং মিথ্যা বলা থেকে রক্ষা পাওয়ার মোক্ষম অবলম্বন। আমি এ মহাসত্যকে স্বীকার করছি। রোযার মধ্যে মানবের সুন্দর চরিত্র সৃষ্টির ঐশী অবদান লুকিয়ে আছে।

মহাত্মা গান্ধী :

মুসলমানদের রোযা উপবাসব্রতের অতি উত্তম নিয়ম। মনের তাগিদে আমিও এ ব্যবস্থা অবলম্বন করি। যদিও আমি একজন খাঁটি ব্রাহ্মণ। আমিও ঠিক রোযার মত নিজের উপর সঠিক পরীক্ষা করে যাই। রোযায় মুসলমানদের আধ্যাত্মিক সুফল পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, পরমাত্মার সঙ্গে যোগাযোগটাও যথেষ্ট নিকটতর হয়। অধিকাংশ সময় আমার উপবাসব্রতের অভ্যাস রয়েছে বলেই আমি মুসলমানদের রোযা সম্পর্কে আমার অভিমত ব্যক্ত করলাম।

ডা: বিধান চন্দ্র রায় :

রোযাকে সুন্দর একটি পবিত্র ঔষধ বললে ভুল, অন্যায় কিংবা অত্যুক্তি হবে না বলেই আমার ব্যক্তিগত ধারণা।

পন্ডিত বিদ্যাসাগার কাশ্মীরী :

রোযা যা ইসলামের নির্দেশ এ ব্রত হচ্ছে পৃথিবীর অপরাপর সমস্ত ব্রত থেকে শ্রেষ্ঠ। আমি আমার স্বজাতি ভাই-বোনকে আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছি, জানাচ্ছি এবং জানাব, উপবাস যদি করতে হয়, তাহলে তারা যেন ঠিক ইসলামী নিয়ম- পদ্ধতিতে পালন করে।

www.amarboi.org

অধ্যক্ষ ডা: জিসিআর গুপ্ত :

পবিত্র রোযা পালনের যে আদেশ ইসলামে আছে, তা মানবের আত্মিক ও দৈহিক মঙ্গলের জন্যই। রোযা সত্যিই উপকারের আকর এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ডা: স্যামুয়েল আলেকজান্ডার :

রোযা হচ্ছে রকমারি মানসিক রোগগুলোর উত্তম ঔষধ, চমৎকার এবং ফলপ্রসূ প্রতিষেধক, আত্মাকে নির্মল করে দেয়, ঠিক তেমনি পবিত্রও রাখে।

অধ্যাপক সোর্ড :

রোযা মানুষকে দুষ্কর্ম থেকে শুধু দূরেই সরিয়ে রাখে না, বরং সাংঘাতিক ও মারাত্মক ধরনের রোগের কবল থেকে রক্ষা করে।

রোগ প্রতিরোধে রোযার ভূমিকা

ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ রোযা কেবল মানবাত্মার পরিশুদ্ধি সাধনই করে না, বরং তা শরীরকে রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় এ ধরনের অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। যখন আমরা খাওয়া বন্ধ রাখি এবং খাওয়ার যন্ত্রকে বিরতি দেই, তখন দেহে সংরক্ষিত জীবনী শক্তির এক নবজীবনের উদ্ভব হয়। ডা: জুয়েলস এম. ডি. বলেন, যখন একবেলা খাওয়া বন্ধ থাকে তখনই দেহ সেই মুহূর্তটিকে রোগমুক্তির সাধনায় নিয়োজিত করে। তিনি আরো বলেন, খাদ্যের পরিপাক ও আত্তীকরণে যে শক্তি ব্যয় হয়, খাওয়া বন্ধ করে আমরা যদি সেই শক্তি অন্যদিকে নিয়োজিত করি, তবে দেহের অপ্রয়োজনীয় বিষাক্ত অংশ বিদূরিত করতে তা কাজ করার সুযোগ পায়। পাক-প্রণালী যখন তার আত্তীকরণে বিরতি দেয়, তখন পাকস্থলী ও অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দেহযন্ত্র থেকে জীর্ণ পদার্থগুলোকে দূরে পরিপাকের বেলায় অনেকটা স্পঞ্জের মত কাজ করে। অতিভোজনের ফলে দেহের স্নায়ুকোষে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। ফলে শরীরে নেমে আসে অস্বাভাবিক ক্লান্তিবোধ ও জড়তা। সিয়াম সেখানে প্রতিষেধকের কাজ করে।

www.amarboi.org

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, প্রতিটি রোগের পেছনে কোন না কোন কারণ রয়েছে। তবে জীবাণুবাহিত রোগগুলোর মধ্যে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস প্রধান। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, পানাহার বন্ধ রাখলে অনেক জীবাণু মারা পড়ে। ডা: ডিউহ্ বলেছেন, জীর্ণ ও ক্লিষ্ট রুগ্ন মানুষটি উপোস থাকছে না, সত্যিকার ভাবে উপোস থাকছে রোগটি। প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস বলেছেন, অসুস্থ দেহে যতই খাবার দিবে রোগ ততই বাড়তে থাকবে। গ্রাহাম রাথলো জেনিংস প্রমুখ গবেষক এ বিষয়টি সত্য বলে প্রতিপন্ন করেছেন। অ্যালেক্রহেগ বলেছেন সর্দিজনিত বধিরতা,অস্থিকোষ ও দাঁতের রোগ সিয়ামে নিরাময় হয় এবং খাদ্যে অরুচি ও অনীহা দূর করে।

প্রবাদ আছে- "উনোভাতে বহুকাল অতিভাতে রসাতল" কথাটি একেবারেই অমূলক নয়। রমযানে অন্য মাসের তুলনায় কম খাওয়া হয়। এই কম খাওয়া স্বাস্থ্যের অনুকূল। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতেও বেশী খাদ্য নয়, কম খাদ্যই দীর্ঘায়ুর চাবিকাঠি। আরো লক্ষণীয়, আমাদের পরিপাক প্রণালীকে ঠিকমত চালানোর জন্য সপ্তাহ অন্তর যদি একদিন পানাহার বন্ধ রাখা যায়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই বরং উপকারিতা রয়েছে নানামুখী। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "পাকস্থলীকে তিন ভাগে ভাগ করে একভাগ খাদ্য, একভাগ পানি ও বাকী একভাগ খালি রাখা ভাল"।

মোট কথা, মানব শরীর একটি যন্ত্র সদৃশ। নির্মাতা যেমন তার যন্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকেন, মানব নামের শরীরটা পরিচালনা করার জন্য কি কি মালমসলা দরকার মানবস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই একমাত্র তা জানা আছে। রোযার ক্ষেত্রে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাআলার আইন প্রণয়নের সে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তাই আল্লাহ যেহেতু বছরের বারো মাসের মধ্যে একমাস রোযা ফরয করছেন, সেহেতু এ নির্দেশকে যথার্থ মনে করা আর তার হুকুম তামিল করা আমাদের একান্ত করণীয়। এতে কারো সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

www.amarboi.org

রোযা স্বাস্থ্যের কি উপকার করে

এক মাস রোযা রাখার ফলে শরীরের অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশ্রাম ঘটে। প্রতি দিন প্রায় ১৫ ঘন্টা সময় এই বিশ্রামে লিভার প্লীহা কিডনী, মূত্রথলিসহ দেহের অভ্যন্তরীণ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দীর্ঘ একমাস কাল ব্যাপী বেশ বিশ্রাম পায়। এতে মানবদেহের যন্ত্রপাতির ও আয়ুষ্কাল বেড়ে যায়। সারা বছর দেহের অভ্যন্তরে যে বিষ সৃষ্টি হয় তা এক মাসের সিয়াম সাধনায় পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

প্রখ্যাত ডাক্তার জয়েলশ বলেন, যখনই কেউএক বেলা খাওয়া বন্ধ রাখে তখনই দেহ সেই মুহূর্তটিকে রোগমুক্তির সাধনায় নিয়োজিত করে।

ডাক্তার এম, রাহাত বলেন, অতি ভোজনের ফলে অনেকেরই পাকস্থলী বড় হয়ে যায়। রোযার ফলে এই বড় পাকস্থলী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

রোযা রাখলে গেসট্রিক আলসার হবে বা বেড়ে যাবে কথাটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিহীন। ফুসফুসে কোন রকম প্রতিবন্ধকা বা বাধার সৃষ্টি হলে রমযানের রোযা তা দূর করে দেয়।

ডা: দেওয়ান, এ,কে, এম, আবদুর রহীম বলেন, রোযা পালনে মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্র সর্বাধিক উজ্জীবিত হয়।

আল্লাহর কুরআন, রাসূলের সুন্নাহ এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষণা সব দিক থেকেই মাহে রমযান মুসলিম জাতির জন্য বিরাট রহমত, স্বাস্থ্যের জন্য অনন্য নিয়ামত। আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য অন্যতম মাধ্যম এতে কোন সন্দেহ নেই। নিজেকে সত্যিকার মানুষে পরিণত করার জন্য নিষ্কলুষ চরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখানোর নিমিত্তে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য রোযা আমার জীবনের জন্য একটি উপকারী ইবাদত। একজন বিবেকবান সুস্থ মুস্তিষ্কের অধিকারী হিসেবে আমরা নিজের স্বার্থেই রোযা রাখবো। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন।

www.amarboi.org

দুই ঈদের নামাযের বিবরণ

ঈদের সূচনা

সকল জাতিরই আনন্দ-উৎসব আছে। সকলেই তা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস ও ইতিহাস-ঐতিহ্য অনুযায়ী পালন করে থাকে। রাসূল করীম (সা.) যখন হিজরত করে মদীনায় তাশরীফ নিলেন তখন দেখতে পেলেন মদীনা বাসী দুটি আনন্দ- উৎসব পালন করে। তার একটির নাম ছিল 'নীরোয এবং আরেকটির নাম ছিল মেহেরজান।

ইসলামের সোনালী যুগে জাহিলী যুগের এ দুটি উৎসব আল্লাহ তাআলা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু উৎসব ও আনন্দ অনুষ্ঠান মানুষের প্রকৃতিগত। তা একেবারেই বন্ধ করে দেয়া মানুষের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে দেয়ার মতো মারাত্মক। তাই আল্লাহ তাআলা জাহিলী যুগের দুটি উৎসব বন্ধ করে দিয়ে অনুরূপ দুটি জাতীয় উৎসবের সূচনা করে দিলেন। এ দুটি উৎসব হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা।

এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهَا فَقَالَ مَا هٰذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوْا كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الاَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ-

অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, যখন নবী (সা.) হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, মদীনাবাসী দু'দিন উৎসব পালন করে এবং খেলাধুলা করে । রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, এ দিন দুটি কিরূপ? তারা বললো, জাহিলিয়াতের সময় এ দু'দিন আমরা খেলাধুলা করতাম। তখন নবী (সা.) বললেন এ দু'দিনের পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে উত্তম দুটি দিন দিয়েছেন। তা হলো, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা।

www.amarboi.org

নবী (সা.) আরো বলেন ঃ

اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا ـ

অর্থাৎ প্রত্যেক জাতিরই ঈদ আছে আর আমাদের ঈদ হলো এ দুটি– 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আযহা'। (বুখারী, মুসলিম)

ইসলাম মানুষের আনন্দ-উৎসব বন্ধ করে দিয়ে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য গতিকে স্তব্ধ করে দিতে আসেনি। অপরদিকে রুচি বিরোধী আনন্দ অনুষ্ঠানও সমর্থন করেনি। বরং পাপ ও অন্যায়ের পথ বন্ধ করে দিয়ে উন্মুক্ত করে দেয় কল্যাণময় ও সর্বজনীন অন্যান পথ ও পন্থা।

ঈদুল ফিতরের মর্ম

শাওয়াল মাসের প্রথম দিন ঈদুল ফিতর উৎসব পালন করা হয়। আল্লাহ তাআলা রমযান মাসের রোযা, তারাবীহতে তিলাওয়াত, দান-খয়রাত প্রভৃতি যেসব ইবাদাত নির্ধারিত করে দিয়েছেন, বান্দাগণ তাঁর তাওফীকেই এগুলো আদায় করতে পেরেছে। তাই আল্লাহ জন্যেই সত্যিকার আনন্দ প্রকাশের উদ্দেশ্যে ঈদুল ফিতরের উৎসব পালন করা হয়।

ঈদুল আযহার মর্ম

জ্বিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ ঈদুল আযহা পালন করা হয়ে থাকে। একে কুরবানীর ঈদও বলা হয়। ঐ উৎসব আসলে ইবরাহীম (আ.)-এর সেই মহান কুরবানীর স্মৃতি বহন করে, যা ইসমাঈল (আ.)-কে আল্লাহর দরবারে পেশ করে ছিলেন। ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর হুকুম পালন করতে গিয়ে নিজ পুত্রের গলায় ছুরি চালিয়েছেন, কিন্তু মানুষ কুরবানী আল্লাহর ইচ্ছা নয়, তাই ইসমাঈল কুরবানী হলেন না। আল্লাহর ইচ্ছায় বেহেশ্‌তী দুম্বা কুরবানী হয়। কুরবানীর সে অতুলনীয় ইতিহাস স্মরণে ঈদুল আযহা পালন করা হয়। এ ব্যাপারে নবী করীম (সা.)-কে সাহাবারা জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কুরবানীর হাকীকত কি? নবী (সা.) জবাবে বললেন ঃ "এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নাত।"

www.amarboi.org

ঈদের রাতের ফযীলত

ঈদের রাতের ফযীলত সম্পর্কে নবী করীম (সা.) বলেন, "যারা সওয়াবের আশায় দুই ঈদের রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত-বন্দেগী করবে, কিয়ামতের দিন ভয় ও আতংকে সকলের অন্তর যখন মরে যাবে, তখন তাদের মরবে না।" অর্থাৎ সে দু'রাতে জাগরণকারী ব্যক্তিগণ আতংকিত হবে না। (ইবনে মাজাহ)

ঈদগাহে যাওয়ার ফযীলত

ঈদুল ফিতরের দিন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের নিয়ে ফখর করেন এবং বলেন, হে ফেরেশতাগণ! যারা তাদের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করে তাদের বদলা কি হওয়া উচিত?" তারা তখন জবাব দেন, হে আল্লাহ! তাদেরকে পুরোপুরি পারিশ্রমিক দেয়া উচিত।

আল্লাহ তাআলা তখন বলেন আমার সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার কসম খেয়ে বলছি, অবশ্যই আমি তাদের দু'আ কবুল করব। নবী (সা.) বলেনঃ ঈদের নামায পড়ে যখন মানুষ বাড়ীতে ফিরে যায় তখন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "তোমরা বাড়ীতে ফিরে যাও। আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিলাম এবং তোমাদের মন্দকে ভাল দ্বারা বদলিয়ে দিলাম।" রাসূল (সা.) বলেন ঃ তখন তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে বাড়ী ফিরে। রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, যখন ঈদুল ফিতরের দিন আসে, তখন ফেরেশতাগণ রাস্তায় দাড়িয়ে বলতে থাকেন, হে মুসলমান! আসো তোমাদের দয়াল প্রভুর দিকে, যিনি স্বীয় দয়ায় তাঁর বান্দাদেরকে নেক কাজের তাওফীক দেন এবং তার উপর বিরাট পুরস্কার দেন। তোমাদের রাতের ইবাদতের (তারাবীহের) হুকুম করা হয়েছিল, তোমরা তা পূরণ করেছ। দিনে রোযা রাখার হুকুম হয়েছিল তাও তোমরা পূরণ করেছ। এখন তোমাদের পুরস্কার নিয়ে যাও। অত:পর যখন সে ঈদের নাযায শেষ করে, তখন একজন আহবানকারী বলতে থাকে, হে মানব মন্ডলী! অবশ্যই তোমাদের রব তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। তোমরা সাফল্যমন্ডিত হয়ে নিজ নিজ বাড়ী ফিরে যাও। (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব)

www.amarboi.org

ঈদের নামায ও খুতবা শুনার হুকুম

ঈদের নামায পড়া ওয়াজিব এবং খুতবা শুনাও ওয়াজিব। অনেক মুসল্লী নামায শেষ করেই ইদগাহ থেকে চলে যান। এটা উচিত নয়। খুতবা না শুনে কেউ ঈদগাহ ত্যাগ করলে ওয়াজিব তরকের গুনাহ হবে। সাহাবায়ে কিরাম নামাযের সফে বসে থেকেই রাসূল (সা.)-এর খুতবা শুনতেন।

ঈদুল ফিতরের দিনে যে কাজগুলো সুন্নাত

১. সাধ্যমত সুন্দর পোশাক পরা, ২. ফজরের নামাযের পর গোসল করা ৩. মিসওয়াক করা। ৪. খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা। ৫.সকাল সকাল ঈদগাহে যাওয়া। ৬. ঈদগাহে যাওয়ার আগে ফিতরা দেয়া। ৭. ঈদগাহে যাওয়ার আগে কিছু মিষ্টি খাওয়া। ৮. ঈদের নামায মসজিদে না পড়ে ঈদগাহে পড়া। ৯. ঈদগাহে এক রাস্তায় যাওয়া এবং অন্য রাস্তায় আসা। ১০. পায়ে হেটে ঈদগাহে যাওয়া। ১১. সুগন্ধি লাগানো। ১২. ঈদগাহে যাওয়ার সময় নিম্নের তাকবীর আস্তে আস্তে পড়াঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ -

ঈদের নামায কোথায় পড়া উত্তম?

নবী করীম (সা.) মদীনা থেকে বের হয়ে খোলা মাঠে ঈদের নামায পড়তেন। তখন দেয়ালঘেরা কোন ঈদগাহ ছিল না। নবী (সা.) যেখানে ঈদের নামায পড়াতেন সে জায়গাটি মসজিদে নববী থেকে এক হাজার কদম দূরে অবস্থিত ছিল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে-

اَنَّهُمْ اَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلَّى بِهِمِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْعِيْدِ فِى الْمَسْجِدِ -

অর্থাৎ এক ঈদের দিনে তাদের সেখানে বৃষ্টি হলো। অতএব নবী (সা.) তাদের নিয়ে ঈদের নামায মসজিদে পড়লেন। (মিশকাত)

www.amarboi.org

নবী করীম (সা.)-এর আমল দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঈদের নামায ঈদগাহে পড়াই উত্তম। তবে বৃষ্টি বা জরুরী কোন প্রয়োজনে মসজিদেও ঈদের নামায পড়া যায়।

ঈদের নামায মসজিদে পড়ার হুকুম

ঈদের নামায ঈদগাহে পড়া সুন্নাত। বিনা ওযরে মসজিদে পড়া মাকরূহ। (বাহ্‌রুর রায়েক)

নবী (সা.) বৃষ্টির কারণে একবার মসজিদে ঈদের নামায আদায় করেছেন। যে যে কারণে মসজিদে ঈদের নামায পড়া যায়, তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. বৃষ্টির কারণে ঈদগাহে যাওয়া অসম্ভব হলে। ২. ঈদগাহে যাওয়ার ক্ষেত্রে অপারগ হওয়া। যেমন প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ হওয়া। ৩. ঈদগাহে স্থান সংকুলান না হলে। ৪. ঈদগাহ যদি এতদূরে হয় যে, জামাআত পাওয়া সম্ভব নয়।

উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়া মসজিদে ঈদের নামায পড়া উচিত নয়। ঈদের জামাআতের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের শান–শওকত প্রকাশ পাওয়া। তাই জামাআত যত বড় হবে, ইসলামের শান-শওকত ততই বৃদ্ধি পাবে এবং সওয়াব বেশী পাওয়া যাবে ।

ঈদের নামায পড়ার নিয়ম

ঈদের নামায বছরে দু'বার পড়া হয় বিধায় এর নিয়ম অনেকেরই জানা থাকে না। তাই এ নামাযের নিয়ম নিম্নে উল্লেখ করা হলো। ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলতে হয়। তিনবার প্রথম রাকআতে এবং তিনবার দ্বিতীয় রাকআতে।

প্রথমে নামাযের মনে মনে নিয়ত করবে। নিয়তের পর আল্লাহু আকবার বলে অন্যান্য নামাযের ন্যায় নাভির নীচে হাত বাঁধতে হবে এবং ছানা পড়তে হবে। ইমামের প্রথম তাকবীরের সাথে আল্লাহু আকবার বলে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় তাকবীরের সময় আল্লাহু

www.amarboi.org

আকবার বলে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ছেড়ে দিবে। তৃতীয় তাকবীরের সময় হাত উঠিয়ে ছেড়ে দিবে না, নাভির নীচে হাত বাঁধবে। এরপর ইমাম আউযুবিল্লাহ ও 'বিসমিল্লাহ' আস্তে আস্তে পড়বেন এবং সূরা ফাতিহার সাথে সাথে অন্য একটি সূরা মিলাবেন এবং যথারীতি রুকূ সিজদা করে প্রথম রাকআত শেষ করবেন। দ্বিতীয় রাকআতে ইমাম রুকূতে যাওয়ার আগে আবার তিন তাকবীর বলবেন। প্রথম তাকবীরে হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় তাকবীরেও কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। তৃতীয় তাকবীর ও একই নিয়মে তাকবীর বলে ছেড়ে দিবে। চতুর্থ তাকবীরটি সময় হাত না উঠিয়ে ইমামের সাথে রুকূতে চলে যাবেন। চতুর্থ তাকবীরটি রুকূর তাকবীর অবশিষ্ট নামায অন্যান্য নামাযের ন্যায় আদায় করবে। (আলমগীরী মাসাইলে রোযা)

কেউ যদি ঈদের নামায না পায় কিংবা আংশিক পায় তার হুকুম

ঈদের নামাযের ওয়াকত সূর্য সাদা হলে শুরু হয় এবং দ্বিপ্রহর পর্যন্ত থাকে। কেউ যদি এমন সময় শরীক হয় যখন ইমাম তাকবীর বলা শেষ করেছেন। তবে যদি ইমামকে দাঁড়ানো অবস্থায় কিরাআতের মধ্যে পায়, তখন নিয়ত বেঁধে একা একা তাকবীর পড়বে। আর যদি ইমামকে রুকূর মধ্যে পায়, তবে যদি মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তাকবীর বলেও ইমামকে রুকূতে পাওয়া যাবে, তখন দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীর বলে তারপর রুকূতে যাবে। আর রুকূ না পাওয়ার আশংকা থাকলে নিয়ত বেঁধে রুকুতেই চলে যাবে, কিন্তু রুকূতে রুকূর তাসবীহ না পড়ে আগে তিন তাকবীর পড়ে নিবে, তারপর সময় থাকলে রুকূর তাসবীহ পড়বে । রুকূতে তাকবীর পড়তে হাত উঠাতে হবেনা। যদি তাকবীর শেষ করার পূর্বেই ইমাম রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে ফেলেন, তাহলে মুকতাদীও দাঁড়িয়ে যাবে। যে পরিমাণ তাকবীর বাকী থাকবে তা মাফ।

আর কেউ যদি দ্বিতীয় রাকআতে শরীক হয় তখন ইমাম সালাম ফেরানোর পর দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াতে হবে। প্রথমে 'ছানা' (সুবহানাকাল্লাহুম্মা) আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও কিরাআত পড়বে। তারপর

www.amarboi.org

রুকূর পূর্বে তিন তাকবীর বলবে। কিরাআতের পূর্বে তাকবীর বলবে না। (বেহেশতী যেওর)

কেউ যদি আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর শরীক হয়, তাহলে সালাম ফেরানোর পর বাকী নামায একা একা আদায় করবে।

যারা ঈদের নামায না পায় তারা কি করবে ?

যারা ঈদের নামায না পাবে কিংবা পেয়েছিল কিন্তু কোন কারণবশত: ফাসেদ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একা একা ঈদের নামায পড়তে পারবে না। কেননা, ঈদের নামাযের জন্য জামাআত শর্ত। ফাসেদ হওয়া নামাযের কোন কাযা করতে হবে না।

তবে যদি একদল লোকের নামায ছুটে যায় বা ফাসেদ হয়, তবে তারা (পূর্ববর্তী ইমাম ছাড়া) অন্য কাউকে ইমাম বানিয়ে ঈদের নামায পড়বে। (বেহেশতী যেওর)

নির্ধারিত দিনে ঈদের নামায না পড়লে অন্য দিন পড়া যাবে কি ?

কোন কারণবশতঃ ঈদুল ফিতরের নামায দ্বিতীয় দিন পড়া যায়। যেমন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুন চাঁদ দেখা যায়নি কিংবা যখন নামায পড়া হয়েছিল, তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় দ্বিপ্রহরের পরে নামায পড়া হয়েছে, অথবা এমন সময় চাঁদের খবর পাওয়া গেলো যখন লোক জমা করা সম্ভব নয়। একই কারণে ঈদুল আযহার নামায তৃতীয় দিনেও পড়া যায়। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)

ঈদের দিন নফল নামায পড়ার বিধান

নবী করীম (সা.) ঈদের নামাযের আগে ও পরে কোন নফল নামায পড়তেন না।

ঈদের নামাযের আগে বাড়ীতে ও ঈদগাহে নফল নামায পড়া মাকরূহ। আর ঈদের নামাযের পর শুধু ঈদগাহে নফল পড়া মাকরূহ বাড়ীতে পড়া জায়েয আছে।

www.amarboi.org

রমযান ঃ জিহাদ ও বিজয়ের মাস

রমযান জিহাদ ও বিজয়ের মাস। কুরআন ও হাদীসে মুমিনদের প্রতি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জিহাদ কষ্টকর কাজ হলেও দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই রমযানে দুটো গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ সংঘটিত হয়। প্রথমটি বদরের যুদ্ধ ও দ্বিতীয়টি মক্কা বিজয়।

দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমযান মুসলমানরা মদীনা থেকে দক্ষিণে বদর প্রান্তরে মক্কা থেকে আগত কাফির কুরায়শ বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদে জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামের শিকড় মযবুত করেন এবং ইসলাম গোটা আরব এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ 'সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং বাতিলের উৎখাত করাই ঐ যুদ্ধের লক্ষ্য।' (সূরা আনফাল)

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

'আল্লাহ তোমাদেরকে বদরের ময়দানের যুদ্ধে সাহায্য করেছেন, তোমরা ছিলে দুর্বল।' (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১২৩)

বদরের জিহাদে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩১৩ জন মাত্র। পক্ষান্তরে কাফিরদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১,০০০ জন। এই যুদ্ধে কাফির সরদার আবূ জাহল নিহত হয়।

বদরের যুদ্ধে ১৪ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। পক্ষান্তরে কাফিরদের ৭০ জন নিহত হয় এবং ৭০ জন সৈন্য বন্দী হয়।

৮ম হিজরীর ২০শে রমযান রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে মক্কা বিজয় হয়। বদর থেকে যে বিজয়ের ধারা শুরু হয়েছে তা মক্কা বিজয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরপর গোটা আরবে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে এবং ইসলাম ও মুসলমানগণ অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়। কুরআন পাকে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ـ

অর্থ ঃ 'আমরা আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি।' (সূরা ফাতহ ঃ ১)

মক্কা বিজয় রক্তপাতহীনভাবে সংঘটিত হয়। নবী করীম (সা.) ও সাহাবায়ে

www.amarboi.org

কিরাম যেই মক্কা থেকে রাতের অন্ধকারে হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন, সেই মক্কাতে তাঁরা ৮ম হিজরীর রমযান মাসে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেন। কাফিরেরা কোন প্রতিরোধ গড়ার সুযোগ ও সাহস কোনটিই রাখেনি।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের পর খোলাফায়ে রাশিদার যুগ শুরু হয়। ২য় খলীফা হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা.)-এর আমলে, ১৫ হিজরীর ১৩ই রমযান হযরত আবূ উবায়দাহ ইবন জাররাহ জেরুসালেম জয় করেন। মক্কার মতো মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্র স্থান বায়তুল মুকাদ্দাসও এই পবিত্র রমযান মাসেই জয় করা হয়।

৪৬৩ হিঃ (১০৭০খৃঃ) ২৫শে রমযান, সেলযুক রাষ্ট্রের সুলতান ও মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক আলক আরসালান বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের উপর জয়লাভ করেন। বাইজানটাইন সম্রাট ৪র্থ রোমানোস মালাজগারদ নামক ঐ যুদ্ধে বন্দী হন এবং তাদের মিত্র রুশ, বৃটিশ, আর্মেনিয়ান, আখবাজ, খাজার গোত্র ও ক্রুশেডাররা সম্মিলিতভাবে পরাজিত হয়। মালাজগারদ এশিয়া মাইনরের পশ্চিমে আখলাত নামক স্থানের কাছে অবস্থিত। বাইজানটাইন বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ৬ লাখ, আর মুসলমানরা ১৫ হাজার মুজাহিদ। তারা কাফনের কাপড় পরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সেলজুক রাষ্ট্রের রাজধানী খোরাসানে পৌঁছার আগেই ক্রুশেডারদের আক্রমণের সম্মুখীন হন। তিনি নিজ সাম্রাজ্যের কিছু ভূখণ্ডের বিনিময়ে রোমানদের সাথে আপোসের চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে রোযাদার কাফন পরিহিত মুজাহিদীনকে নিয়ে খৃস্টান বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাদের তাকবীর ধ্বনিতে শত্রুবাহিনী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়।

একটু পরেই রোমানোসকে বন্দী হিসেবে ধরে আন[illegible]য়। আলক আরাসালান মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ না করার প্রতি[illegible]র ভিত্তিতে তাকে মুক্তি দেন এবং তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁয়ছে দে[illegible]। ১৫ হাজার দীনার উপহারসহ তাকে বিদায় করে দেন। সাথে তার অন্যান্য মন্ত্রী ও সেনাধ্যক্ষদেরকেও মুক্তি দেন।

www.amarboi.org

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা